জবাব

ইসলাম-বিরোধী বিভিন্ন ইস্যুতে
মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিউত্তর

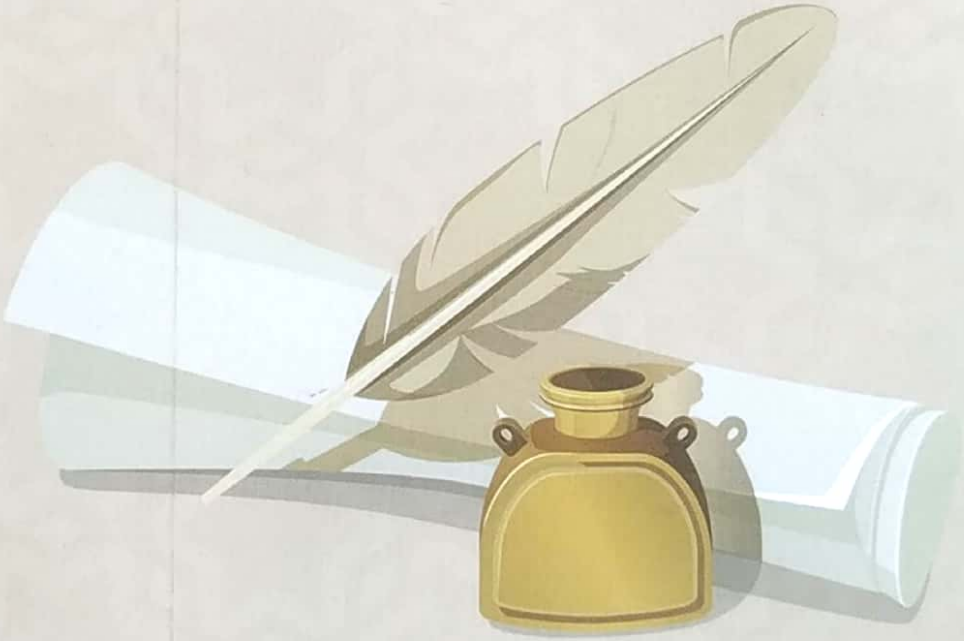

আরিফ আজাদ, শামসুল আরেফিন শক্তি, মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার, আরিফুল ইসলাম, শিহাব আহমেদ তুহিন, রাফান আহমেদ, জাকারিয়া মাসুদ, মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, মহিউদ্দিন রূপম, মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন, নাফিস শাহরিয়ার, মুরসালিন নিলয়, মুহাম্মাদ সাদাত, মুহাম্মাদ আল বান্না, আহমাদ আল-উবায়দুল্লাহ

Scanned by CamScanner

বই	জবাব
সম্পাদনা	মুফতি তারেকুজ্জামান, মুফতি আবুল হাসানাত কাসিম, জাকিয়া সিদ্দীকি
বানান ও ভাষারীতি	যাহিদ আহমাদ, জাবির মুহাম্মাদ হাবিব, মাহবুবুর রহমান
প্রচ্ছদ	সমকালীন গ্রাফিক্স টীম

Scanned by CamScanner

জবাব

ইসলাম-বিরোধী বিভিন্ন ইস্যুতে মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিউত্তর

আরিফ আজাদ, শামসুল আরেফিন শক্তি, মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার, আরিফুল ইসলাম, শিহাব আহমেদ তুহিন, রাফান আহমেদ, জাকারিয়া মাসুদ, মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, মহিউদ্দিন রূপম, মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন, নাফিস শাহরিয়ার, মুরসালিন নিলয়, মুহাম্মাদ সাদাত, মুহাম্মাদ আল বান্না, আহমাদ আল-উবায়দুল্লাহ

Scanned by CamScanner

জবাব

প্রথম প্রকাশ

একুশে বইমেলা ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই-ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার, ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

মুদ্রণ

স্বরবর্ণ প্রিন্টিং এন্ড প্রেস

১৩৫/১৪৪, ডি.আই.টি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৪০৯-৩০৪০৫০

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com
www.islamiboi.com
www.wafilife.com

ISBN : 978-984-95663-1-1

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 300.00 US $ 10.00 only.

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০। ফোন : ০১৪০৯-৮০০-৯০০

Scanned by CamScanner

শুরুর আগে

২০১৩ সালের শেষের দিকে হঠাৎ করে কমিউনিটি ব্লগগুলো বাংলা অন্তর্জালে বেশ পরিচিতি পাওয়া শুরু করে। অসংখ্য মানুষ নিজেদের শখের লেখালেখি আর সময় কাটানোর মাধ্যম হিশেবে ওই সকল ব্লগগুলোতে যুক্ত হয়। বলা বাহুল্য—সুযোগটাকে চমৎকারভাবে লুফে নেয় বাংলার তথাকথিত নাস্তিক-মহল এবং দিন-রাত তারা সেখানে ইসলামের নানান অনুষঙ্গ, বিধি-বিধান, আল্লাহ-নবি-রাসুল নিয়ে কটুক্তি, মিথ্যাচার আর প্রোপাগাণ্ডা চালাতে শুরু করে।

ওই সময়টায় নাস্তিকরা যতটা সাড়ম্বরে ব্লগের জগতে আসে, চিন্তাশীল মুসলিমদের পদচারণা ছিল যেন ততই মৃদু। যেহেতু মুসলমানদের তরফ থেকে পাল্টা প্রতি-উত্তর আসছিল না, ফলে ওই সকল নাস্তিক ব্লগারদের একাধিপত্যই তখন ব্লগগুলোতে বিরাজমান।

এরপর, একসময় তৈরি হলো সদালাপ ব্লগ। আমার মনে পড়ে—ওই সময়ে নাস্তিক ব্লগারদের যাবতীয় মিথ্যাচার আর অপবাদের জবাব আসতো সদালাপ ব্লগ থেকেই। শুধু জবাব-ই না, পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হতো নাস্তিকদের। সদালাপ ব্লগের ওই সময়কার অনেক ভাইকে আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। সরওয়ার ভাই, আবদুল্লাহ সাঈদ খান ভাই, শাহবাজ নজরুল ভাই, রায়হান ভাই, শামস ভাই, সাদাত ভাই, মুনিম সিদ্দীকী ভাই সহ ছদ্মনামের আঁড়ালে থাকা আরো অনেক ভাইয়েরাই তখন নাস্তিকদের বিরুদ্ধে শক্ত জবাব নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আল্লাহ যেন ভাইগুলোকে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

Scanned by CamScanner

২০১৫-র শেষ দিক থেকেই মুশফিকুর রহমান মিনার ভাই এমন একটি ওয়েবসাইটের পরিকল্পনা করেন যা হবে নাস্তিক্যবাদী সকল ব্লগের জবাব। এক ওয়েবসাইটের মাঝেই ইসলামবিরোধীদের সকল অপপ্রচারের জবাব থাকবে। ২০১৬ সাল থেকে এই সাইটের জন্য প্রবন্ধ লেখা ও সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। সে সময়ে প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ড. খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহর কাছেও এই ওয়েবসাইটের পরিকল্পনা জানানো হয়েছিল। তিনি সব শুনে এ জন্য সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটি নিয়ে কাজের জন্য তার সাথে দেখা করবার মাত্র ২ দিন আগে তিনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন।

এরপরেও অব্যাহত ছিল ওয়েবসাটের কাজ। অবশেষে ২০১৮ সালে আলোর মুখ দেখতে পায় 'ইসলামবিরোধীদের জবাব—Response To Anti-Islam' (www.response-to-anti-islam.com)। নাস্তিকদের উত্থাপিত যাবতীয় প্রশ্ন, অভিযোগ-আপত্তির জবাব সংবলিত সবিস্তার প্রবন্ধ রয়েছে এই ওয়েবসাইটে। অনেক লেখক এবং কলা-কুশলীর অক্লান্ত পরিশ্রমে সমৃদ্ধ এই সাইট। এই সাইটের জন্য তৈরি করা হয়েছে Android এবং iOS অ্যাপ। ফলে যে কেউ খুব সহজেই নিজ মোবাইল ফোনে অ্যাপগুলো ডাউনলোড করে লেখাগুলো পড়ে ফেলতে পারেন।

ওয়েবসাইট থেকে বাছাইকৃত সেরা লেখাগুলোর একটি সংকলন হচ্ছে *জবাব*। ওয়েবসাইট ও অ্যাপের পাশাপাশি বইয়ের মাধ্যমেও বিশ্বাসের কথাগুলো ছড়িয়ে দিতে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

জবাব অনেক লেখকের সমন্বিত চেষ্টার ফল। প্রথিতযশা অনেক লেখককে চিন্তাশীল, ভাবনা-জাগানিয়া, গবেষণাধর্মী লেখায় সমৃদ্ধ এই সংকলন। নাস্তিক্যবাদ-বিরোধী কাজগুলোতে *জবাব* নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা সংযোজন হতে যাচ্ছে বলেই আমার বিশ্বাস।

মানুষকে ঈমানের পথে ডাকতে যেসব মানুষ নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন তাদের সবার জন্য অপরিসীম দুআ আর ভালোবাসা। *জবাব* বইতে যেসব লেখকদের লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাদের জন্যও অফুরান ভালোবাসা। অনেক অনেক ভালোবাসা বইটির সংকলক মুশফিকুর রহমান মিনার ভাইয়ের জন্যও । আল্লাহ যেন কাজটাকে কবুল করেন, আমিন।

—আরিফ আজাদ

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

বিজ্ঞান ও বিশ্বাস—যা আমাদের অজানা - ডা. রাফান আহমেদ ৯

অ্যান আপিল টু কমনসেন্স - আরিফ আজাদ ১৯

আল্লাহর অস্তিত্ব : কুরআনের আর্গুমেন্ট - মুহাম্মাদ আল বান্না ২৬

হিউম্যান : মানব না দানব? - ডা. শামসুল আরেফীন শক্তি ৩৩

নারী-স্বাধীনতা নাকি দাসত্ব? - মহিউদ্দিন রুপম ৪১

একটি প্রশ্ন, একটি উত্তর - উস্তায মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ৪৬

আলেকজান্দ্রিয়ার বইগুলো কে পুড়িয়েছেন? - আরিফুল ইসলাম ৪৯

কুরআনে এত পুনরুক্তি কেন? - নাফিস শাহরিয়ার ৫৭

কুরআনের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি বর্তমান হতে ভিন্ন? - মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার ৫৯

নারীরা কি স্বল্পবুদ্ধির? অধিকাংশই কি জাহান্নামী? - আহমাদ আল-উবাইদুল্লাহ ৬৫

দাসপ্রথা ও ইসলাম - মুহাম্মাদ সাদাত ৮৫

উৎসর্গের উৎসবে - মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার ৯৭

আবু লাহাবের ব্যাপারে অভিশাপপূর্ণ বাণী প্রসঙ্গ - নাফিস শাহরিয়ার ১০২

Scanned by CamScanner

স্রষ্টার প্রজ্ঞার অনন্য এক নিদর্শন—নাসখ - শিহাব আহমেদ তুহিন ১০৮

বকরির পেটে কুরআনের আয়াত! - মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার ১২১

কুরআনের আয়াত-সংখ্যার গণনায় ভিন্নতা কেন? - মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন ১২৮

আগে ও পরে মারা যাওয়া ব্যক্তি কি সমান শাস্তি পাবে? - মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার ১৩৬

হিজড়াদের হত্যা করা! - উস্তায মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ১৪০

তবে কি বিজ্ঞান একাই লড়েছিল? - মুরসালিন নিলয় ১৪৮

স্রষ্টা থাকতে মানুষ কেন অনাহারে থাকে? - নাফিস শাহরিয়ার ১৫৪

অলৌকিক কিছু ঘটলে পরে... - নাফিস শাহরিয়ার ১৬৩

ইসলামে দাসীদের ব্যাপারে বিধান - মুহাম্মাদ সাদাত ১৬৮

ভিন্ন কিরাআতে ভিন্ন কথা! - উস্তায মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ১৮৬

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র - জাকারিয়া মাসুদ ১৯৩

Scanned by CamScanner

বিজ্ঞান ও বিশ্বাস—যা আমাদের অজানা

ডা. রাফান আহমেদ

ছেলেবেলায় বিজ্ঞানের প্রথম যে বইটি আমি হাতে পেয়েছিলাম—তা ছিল একটি সায়েন্স ফিকশন; মজাই লাগত পড়তে। ভবিষ্যতের নায়ক বাইভার্বেল নামক এক অদ্ভুত বাহনে চড়ে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, হাতে থাকা ক্রিস্টাল স্ক্যান করতেই মুহূর্তের মাঝে হলোগ্রাফিক মানুষ যান্ত্রিক কণ্ঠে 'হ্যালো' বলে উঠছে, মাথার পেছনে থাকা পোর্ট দিয়ে সরাসরি তাকে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে; ফলে সে প্রবেশ করছে পরাবাস্তব জগতে! এমন আরও কত কী! গাদা-গাদা সায়েন্স ফিকশন পড়ার পর বর্তমান বিজ্ঞানের বই হাতে আসার পর জেনেছি—সেগুলো ছিল পপুলার সায়েন্সের বই; সংক্ষেপে এদের বলা হয় পপ সায়েন্স। এগুলোতে দেখি বিজ্ঞানের জয়জয়কার; শুধু চমক লাগানো তথ্য আর ছবির সমাহার। পড়ালেখা বাদ দিয়ে গোগ্রাসে গিলতাম সেগুলো। বিজ্ঞান সম্পর্কে এমন ধারণা নিয়েই হয়তো চলতাম; যদি না বিজ্ঞানকে আমার আদর্শিক অবস্থানের বিপরীতে দাঁড় করানো হতো।

ভার্সিটি লেভেলে উঠে যখন আরও বড় একটি জগতের সাথে পরিচয় ঘটে, তখন আগের জীবনে শেখা অনেক কিছুতেই সংশয় আসতে শুরু হয়। এই পথে একসময় প্রায় হারিয়ে ফেলি আমার পরিবার থেকে পাওয়া ইসলামের প্রতি বিশ্বাস (পরে জেনেছিলাম—সেই বিশ্বাসটাও আসলে ফোক ইসলাম ছিল, মূল ইসলাম না)। এই হারিয়ে ফেলার পেছনে নাস্তিকদের প্রচার করা একটি ন্যারেটিভ ভূমিকা রেখেছিল। তাদের মতে, বিজ্ঞান হলো কেবলই যুক্তি-প্রমাণসিদ্ধ সত্যের ঘনঘটা। আর ধর্ম

Scanned by CamScanner

হলো অপ্রমাণিত কিছু বিশ্বাসের ডালা। বিশ্বাসের বালাই বিজ্ঞানের গণ্ডিতে নেই। বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় বিজ্ঞানপ্রচারকের ভক্ত হওয়ার কারণে তার লেখা থেকেই বিজ্ঞান আর ধর্মের তফাতটা চট করে শিখে ফেলি। তিনি বলেছেন—

'ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস, কাজেই ধর্মগ্রন্থে যা লেখা থাকে সেটাকে কেউ কখনো প্রশ্ন করে না, গভীর বিশ্বাসে গ্রহণ করে নেয়। বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই।'[১]

অধিকাংশ মানুষ চিন্তা ছাড়াই সমাজের প্রচলিত ন্যারেটিভ মেনে নেয়, সেলিব্রেটিদের অনুসরণ করে; আমিও তাই করতাম হয়তো; কিন্তু কী যেন বাদ সেধে বসল। ভাবলাম—একটু বিদ্রোহী হই; মেনে নেওয়ার আগে পরখ করে দেখি। পরখ করতে গিয়ে দেখি, ওরে বাপস্, এ যে কেঁচো খুঁড়তে সাপ! গল্পটা বলি একটু।

গরম চা রেডি তো? চায়ে চুমুক দিয়ে পড়ার মজাই আলাদা।

☆☆☆

বিজ্ঞান পড়তে গিয়ে প্রথমেই আগ্রহ জাগে বিজ্ঞান কাকে বলে, তা বোঝার। ইন্টারনেট ও ইউটিউব ঘুরে জানতে পারি, বিজ্ঞান-দর্শন (Philosophy of science) বলে একটা বিষয় আছে; আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয়। বিজ্ঞানীরা বস্তুজগতের নানা বিষয়; যেমন: মৌল বা যৌগ, কোনো প্রাণী, পদার্থের গতিবিধি ইত্যাদি গবেষণা করে সিদ্ধান্ত দেন; আর বিজ্ঞানের দার্শনিকেরা কীভাবে বিজ্ঞানীরা এসব সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন অর্থাৎ তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি কী তা নিয়ে গবেষণা করেন। সোজা কথায়—

বিজ্ঞানের কর্মপদ্ধতি, এর অনুমান, উপযোগিতা, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি নিয়ে কলম চালান। এ নিয়ে বেশকিছু বইও পড়ে ফেললাম। বিভিন্ন ধরনের একাডেমিক বই। আগ্রহ এতই চরমে উঠল, মেডিকেলের নাভিশ্বাস তোলা পড়াশোনার মাঝেও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন কোর্সও করে ফেলি। এই পড়াশোনার মাঝেই বুঝতে পারি, বিজ্ঞানের দর্শন সম্পর্কে অধিকাংশ বিজ্ঞানী সামান্যই ধারণা রাখেন। বিজ্ঞানের সুফলই তাদের জন্য যথেষ্ট, আমাদের জন্যও

---

[১] *একটুখানি বিজ্ঞান*, মুহম্মদ জাফর ইকবাল; পৃষ্ঠা : ১৩ (কাকলী প্রকাশন, ২০০৬)

Scanned by CamScanner

তা-ই। আমি যে ফিল্ডে কাজ করি, সেখানেও একই দশা। আপনি ১০০ জন মেডিসিনের প্রাজ্ঞ প্রফেসরকে যদি জিজ্ঞেস করেন মেডিসিনের দর্শন পড়েছেন? আপনার কথা শুনে তারা আপনাকে পাগল ঠাওরাবে। অথচ আমি নিজেই বিজ্ঞানের দর্শনের পেছনে ছুটতে ছুটতে মেডিকেলের দর্শন নিয়ে লেখা একাডেমিক বইও পেয়ে গেছি।

বিজ্ঞানের দর্শন পড়ে জানতে পারি, বিজ্ঞান তার গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আগেই কিছু ধারণাকে 'ঠিক' বলে 'ধরে নেয়'; অন্যভাবে বললে, 'বিশ্বাস করে নেয়'! এগুলোকে বলা হয় এসাম্পশান/প্রিসাপজিশানস অব সায়েন্স (assumption or presupposition of science)! নামকরা একজন একাডেমিকের বইতে প্রিসাপজিশানের সংজ্ঞায় দুটি বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে[১]—**এক.** প্রারম্ভিক ধারণা। **দুই.** যা যাচাই বা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

এইবার লেগে গেল খটকা! এতদিন কোন বিজ্ঞান শিখলাম মুখরোচক বই পড়ে! একাডেমিক বই দেখি মুখ তেতো করে দিলো! এতদিন বিজ্ঞান শিখে এলাম—বিজ্ঞান মানে যুক্তি-প্রমাণের তীক্ষ্ণ ধার। এর মধ্যে বিশ্বাসের ভোঁতা ছুরি ঢুকে গেল কীভাবে! নামকরা একাডেমিক প্রকাশনীর একটি বইতে ইমেরিটাস অধ্যাপক[২] লিখেছেন[৩]—

> [S]cience based on a set of presuppositions or beliefs that cannot be proved by logic or firmly established by evidence. If this proposition is correct, then it would be reasonable to conclude that since science rests on a foundation of statements that are assumed to be true but that cannot be proved/firmly established, science fundamentally is a matter of faith! A statement that many scientists would find shocking due to their lack of serious reflection on the foundations of their fields of endeavor and

---

[1] *Scientific Method in Practice*, Hugh G. Gauch Jr.; P. 131 (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)

[২] ইমেরিটাস একটি ল্যাটিন শব্দ। এর আক্ষরিক অর্থ প্রবীণ সৈন্য। বিশ্বজুড়ে এই উপাধি কেবল বিশিষ্ট অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদদের প্রদান করা হয়। তাদের কর্ম ও স্বতন্ত্র অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা। জ্ঞান, মান ও চলমান গবেষণার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে রেখে দিতে চান।

[3] *Research Methodology : The Aims, Practices and Ethics of Science*, Peter Pruzan, p. 44 (Switzerland: Springer, 2016)

Scanned by CamScanner

> their strong faith in science as providing true and objectively testable knowledge of physical reality. : firmly established, science fundamentally is a matter of faith! A statement that many scientists would find shocking due to their lack of serious reflection on the foundations of their fields of endeavor and their strong faith in science as providing true and objectively testable knowledge of physical reality.

ভেবেছিলাম আমার দেশের কোনো পণ্ডিত মনে হয় এটা বুঝতে পারেননি এখনো। পরে দেখি যে, না, একজন আছে। তিনি এই বাস্তবতা বুঝতে পেরে লিখেছেন[১] :

> **বিজ্ঞান সম্পর্কে মনে করা হয়, জ্ঞানের এ শাখা যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক এবং এখানে বিনা বিচারে কোনো কিছুই গ্রহণ করা হয় না; কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো যে, বিজ্ঞানের যৌক্তিক কাঠামোর মধ্যেও অন্তর্নিহিত রয়েছে অযৌক্তিক এবং অল্প যৌক্তিক নানা দিক। যেমন বিশ্বাসের কথাই ধরা যাক। প্রচলিতভাবে এটা মনে করা হয় যে, বিশ্বাস হলো ধর্মের ভিত্তি, যা বিনা বিচারে গ্রহণ করা হয়; কিন্তু বিজ্ঞানের যৌক্তিক কাঠামোর মধ্যে যদি বিশ্বাসকেও লক্ষ করা যায়, তাহলে বলব, বিজ্ঞানের এ কাঠামোর মধ্যে যুক্তি ও বিশ্বাসের দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান রয়েছে।**

শুরুতে ভেবেছিলাম একটা-দুটো হবে বোধহয়। পরে দেখি, নাহ! ভালোই বিশ্বাস রয়েছে বিজ্ঞানের ডালায়।[২] কয়েকটা বলা যাক—

এক. বিজ্ঞানের বিশ্বাসগুলোর মাঝে একটি বিশ্বাস হলো—আমাদের ইন্দ্রিয় ও চিন্তাজগতের বাইরে এই বিশ্বজগতের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। যেমনটা আইনস্টাইন বলেছিলেন—

> **যে-কারো ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভূতির বাইরে বহির্জগতের[৩] যে আসলেই অস্তিত্ব রয়েছে, এমন বিশ্বাস সকল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি।[৪]**

---

[১] *বিজ্ঞানের দর্শন*, গালিব আহসান; ভূমিকা (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫)

[২] *The Nature Of Modern Science & Scientific Knowledge*, Dr. Martin Nickels, Anthropology Program, Illinois State University, August 1998

[৩] চোখ, কান, স্পর্শ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা যা অনুভব করা যায়।

[৪] *The Ten Assumptions of Science: Towards a New Scientific worldview*, Glenn Borchardt, p. 14 (iUniverse 2004)

Scanned by CamScanner

কিন্তু বিশ্বজগতের অস্তিত্ব প্রমাণে আমাদের ইন্দ্রিয়ভিত্তিক অনুভূতি যথেষ্ট নয়। তাই শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে জগতের অস্তিত্বশীলতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা স্রেফ একটি অনুমান। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তার *দর্শনের সমস্যাবলি* গ্রন্থে অনেক আগেই দেখিয়েছেন—ইন্দ্রিয় উপাত্তের সঙ্গে কোনো কিছুর অস্তিত্বের নিশ্চিত সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান দ্বারা কোনোকিছুর বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না। ডেভিড হিউমও একই মত দিয়েছেন। আমেরিকার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক জর্জ সান্তায়ানা এমন বিশ্বাসকে মজা করে বলেছেন 'এনিমেল ফেইথ' মানে অযৌক্তিক বিশ্বাস।[১] অথচ এমন একটি বিশ্বাসকে সত্য 'ধরে' নিয়েই এই জগতকে বিজ্ঞান 'অস্তিত্বশীল' বলে জ্ঞান করছে।

দুই. এই বিশ্বজগৎ আমাদের পক্ষে ঠিকঠাক বুঝে ওঠা সম্ভব। অন্যভাবে বললে, আমাদের চিন্তাশক্তির ওপর আমরা ভরসা করতে পারি। এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-লেখক মারগারেট ভার্থেইম বলেন[২]—

> **আমরা সবাই কিছু-না-কিছু বিশ্বাস করি এবং বিজ্ঞান নিজেও কিন্তু একগাদা বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। শুরুতেই বলা যায়, বিজ্ঞান এই বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে যে, বিশ্বজগৎকে আমরা বুঝতে পারি এবং আমাদের উদ্ভাবন-ক্ষমতা এবং আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ব্যবহার দ্বারা আমরা শেষমেশ সব জেনে যাব।**

আমরা যে 'যৌক্তিক চিন্তাক্ষমতাসম্পন্ন জীব'—এটাও কিন্তু বিজ্ঞানের অনুমান। যদিও বিবর্তনের দর্শন এই অনুমানকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। কারণ, এ মতে মানুষ কেবলই দীর্ঘ এক বিবর্তন-প্রক্রিয়ার আকস্মিক ফল। যে প্রক্রিয়া নিজেই জড়, এলোমেলো, উদ্দেশ্যহীন। বিবর্তনের চাবিকাঠি হলো—ক্রমাগত জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমের জয়। এই প্রক্রিয়ায় এমন প্রজাতি আবির্ভূত হবে, যা কেবল বেঁচে থাকা আর বংশধর রেখে যাওয়ার মতো যথেষ্ট যোগ্য, ব্যস। সত্যের সন্ধান করা বিবর্তনের লক্ষ্য নয়। স্রেফ বেঁচে থাকা আর আবিষ্কারের খোঁজ—দুটো দুই জিনিস। তেলাপোকা মহাশয়ও তো বেঁচে আছে; ও নিউক্লিয়ার হলোকাস্টও সয়ে নেয়;

---

[১] *The Oxford Handbook of Religion and Scince*, David Ray Griffin, ; p. 458 (Edt. Phillip Clayton, Zachary Simpson, Oxford University Press 2006)

[2] *What We Believe but Cannot Prove*, John Brockman (etd.) ; p. 176 (Perfectbound 2006)

Scanned by CamScanner

কিন্তু ওকে কি কখনো দেখা গেছে, বসে বসে রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা পড়তে কিংবা মহাবিশ্ব-উৎপত্তির ইতিহাস বোঝার জন্য ভূতলে গবেষণা করতে? আমাদের চিন্তাক্ষমতার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে স্বয়ং ডারউইন সাহেবও অনিশ্চিত ছিলেন। ডিএনএ'র ডাবল হেলিক্স মডেল প্রণেতাদ্বয়ের একজন, নোবেল বিজয়ী সুপরিচিত নাস্তিক বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিকও এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন[১]—

> **সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের জন্য আমাদের অত্যন্ত বিকশিত মস্তিষ্কটি বিবর্তিত হয়নি; বরং স্রেফ বেঁচে থাকা আর বংশধর রেখে যাওয়ার জন্য আমাদের যথেষ্ট দক্ষ করে তুলতে বিবর্তিত হয়েছে।**

তিন. প্রকৃতি সকল ক্ষেত্রে এক নিয়মানুসারী (Uniformity of Nature)। ফলে, একটি পরীক্ষা একই পরিবেশে কয়েকবার চালালে একই ফল পাওয়া যাবে। এর আরেক বিবরণ হলো—প্রাকৃতিক সূত্রগুলো অপরিবর্তনীয়। এগুলো শুরুতে যেমন ছিল, আজও তেমন আছে আর ভবিষ্যতেও তেমনই থাকবে। এটাও অনুমান মাত্র।

ডেভিড হিউমও এই অনুমানকে যথার্থ মনে করতেন না।[২] একদল কসমোলজিস্ট মনে করেন—প্রকৃতির সূত্রগুলোও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেছে, এখনকার সূত্রগুলো অতীতেও এমন ছিল—এমনটা না-ও হতে পারে।

চার. আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটে সেসব প্রাকৃতিক ঘটনার জাগতিক ব্যাখ্যা দেওয়াই যথেষ্ট। বস্তুজগতের বাইরের কিছু বা প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরের কিছুকে কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যাস্বরূপ টেনে আনা যাবে না। এই বিশ্বাসকে বলা হয় Methodological Naturalism বা পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ। এটাই বিজ্ঞানের সর্বপ্রধান অনুমান বা বিশ্বাস।

এর সম্পর্কে না জানার কারণে অনেকে ভুল ধারণা লালন করেন, বিজ্ঞান স্রষ্টাকে খুঁজে পায়নি বা বিজ্ঞান কোনো পরমসত্তাই বিশ্বাস করে না। আসল কথা হলো—বিজ্ঞান স্রষ্টাকে খুঁজতে যায় না। স্রষ্টা আছে কি নেই, সে বিষয়ে বিজ্ঞান নীরব হয়ে

---

[1] *The Astonishing Hypothesis : The Scientific Search for the Soul*, Francis Crick ; p. 262 (New York: Charles Scribner's Sons, 1994)

[2] *An Enquiry concerning Human Understanding*; 4.1, p.15

Scanned by CamScanner

বসে থাকে। আমেরিকার বিখ্যাত ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস-এর বিবৃতিতে এ ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে—

> **বিজ্ঞান হলো প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের একটি উপায়। প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে জাগতিক ব্যাখ্যা প্রদানেই এটি সীমাবদ্ধ। অতিপ্রাকৃত কিছু আছে কি না, সে বিষয়ে বিজ্ঞান কিছুই বলতে পারে না। স্রষ্টা আছে কি নেই, এ প্রশ্নের ব্যাপারে বিজ্ঞান নীরব।**[১]

যদি সকল তথ্য-উপাত্ত কোনো স্রষ্টার দিকে ইঙ্গিত করে, তবে তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই বিজ্ঞানের কাজ! জাগতিক ব্যাখ্যা প্রদানেই বিজ্ঞান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জীববিজ্ঞানী স্কট টড বিখ্যাত সায়েন্স জার্নাল Nature-এ প্রকাশিত এক চিঠিতে এই বাস্তবতা স্বীকার করে বলেন—

> **জগতের সকল উপাত্ত যদি কোনো বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন স্রষ্টার দিকে ইঙ্গিত করে, তারপরও এমন অনুকল্প বিজ্ঞান থেকে বাদ দেওয়া হয়; কারণ, এই ব্যাখ্যা প্রকৃতিবাদী নয়। তবে ব্যক্তি হিসেবে কোনো বিজ্ঞানী এমন বাস্তবতাকে সাদরে গ্রহণ করতে পারেন—যা (পদ্ধতিগত) প্রকৃতিবাদের উর্ধ্বে।'** [২]

বৈজ্ঞানিক মহলে আরও কিছু ধারণা জেঁকে বসে আছে অনেক দিন হলো। বিজ্ঞানী রুপার্ট শেল্ড্রেক তার গ্রন্থে এমন দশটি বিশ্বাসকে তালিকাবদ্ধ করেছেন। গবেষণায় দেখা গেছে—এই প্রতিটি বিশ্বাসেরই ব্যত্যয় ঘটেছে, বিপরীতে প্রমাণ মিলেছে।[৩] এদিকে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রগ্রেসিভ সায়েন্স ইন্সটিটিউটের পরিচালক, নাস্তিক বিজ্ঞান-দার্শনিক গ্লেন বরচার্ড *The Ten Assumptions of Science Towards a New Scientific Worldview* গ্রন্থে বিজ্ঞানের দশটি দার্শনিক অনুমানকে লিপিবদ্ধ করেছেন। যথা—

---

[1] https://www.nap.edu/read/5787/chapter/6#58

[2] *A view from Kansas on that evolution debate*, Scott C. Todd ; Nature, vol. 401, p. 423 (30 September 1999)

[3] *Science Set Free : 10 Paths to New Discovery; introduction* (epub version, Rupert Sheldrake, New York, Deepak Chopra Books 2012)

Scanned by CamScanner

1. Materialism	6. Complementarity
2. Causality	7. Irreversibility
3. Uncertainty	8. Infinity
4. Inseparability	9. Relativism
5. Conservation	10. Interconnection

কী, চোখ কপালে উঠে গেল নাকি? দেখেন তো, কেমন ধোঁকাবাজি করা হয়েছে আমাদের সাথে! আমরা কোন বিজ্ঞান শিখলাম আর বিজ্ঞান আসলে কী!! কত রকম বিশ্বাসের কথকতা! বিস্তারিত আলোচনা শেষে গবেষক (যিনি নিজেও বিজ্ঞানের কড়া সমর্থক) নিজেই লিখেছেন[১]—

> **[দা]র্শনিক আর.জি. কলিংউড ঠিকই বলেছেন : বিজ্ঞান আগে থেকেই অনুমান করে নেওয়া কিছু ধারণার ওপর নির্ভরশীল। এ কথা বিজ্ঞান 'ফ্যাক্ট' নয় বরং 'বিশ্বাস'-এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে—এমনটা বলার সমতুল্য।**

বাস্তবতা হলো—জ্ঞানের সূচনাই হয় বিশ্বাস থেকে। যাচাই হওয়ার পর বিশ্বাস থেকে জ্ঞানের জন্ম হয়। বিশ্বাস মানব-জ্ঞান-ভান্ডারের প্রতিটি ক্ষেত্রের গোড়াতেই আছে। এই বিষয়গুলো জানলে আমরা বিজ্ঞানবাদী নাস্তিকদের হঠকারিতা সহজেই ধরে ফেলতে পারব। যখন নাস্তিকদের কোনো সস্তা সাইটে সেলিব্রেটি নাস্তিকের উক্তি তুলে ধরা হবে—

> **এই মহাবিশ্বের বিস্ময় দেখে আমার একসময় একজন মহানির্মাতার ছবি মনে আসত। ডারউইনের বিজ্ঞান পড়ার পর, সেই ছবি মন থেকে উধাও হয়ে যায়।[রিচার্ড ডকিন্স][২]**

তখন আপনি সংশয়ে না পড়ে মুচকি মুচকি হাসবেন। কেন? প্রথমেই দেখেন—

---

[1] *The Ten Assumptions of Science: Towards a New Scientific worldview*, Glenn Borchardt; p. 119

[২] অতনু চক্রবর্তী, রিচার্ড ডকিন্স : ধর্মান্ধতা আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যিনি লড়ে চলেছেন নিরন্তর! এগিয়ে চলো, ২৭ মার্চ ২০১৮

Scanned by CamScanner

ডকিন্স 'ফিতরাহ'র[১] স্বীকৃতি দিচ্ছেন। মহাবিশ্বের বিস্ময় দেখে এক মহানির্মাতার ইঙ্গিত পাওয়ার প্রবণতা মানুষের মনস্তত্ত্বে গ্রোথিত।[২] যেহেতু পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদে বিশ্বাসের কারণে, বিজ্ঞান স্রষ্টাকে সমীকরণের বাইরে রেখে যাত্রা শুরু করে, তাই বৈজ্ঞানিক বিবর্তন তত্ত্বের প্রচেষ্টাও হলো মানুষ-সহ সকল প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশের জাগতিক ব্যাখ্যা দেওয়া। তাই ডারউইনের বিজ্ঞান পড়ে কেবল তার মন থেকেই স্রষ্টার ধারণা উধাও হতে পারে সে বিজ্ঞানের এসাম্পশানগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ। বিজ্ঞানের যেকোনো তত্ত্বই স্রষ্টার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের ব্যাপারে নীরব। যেমন সেলিব্রেটি নাস্তিক প্রফেসর লরেন্স এম. ক্রউস বলেন—

> **বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে বিবর্তনবাদ স্রষ্টার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের বিষয়ে কিছুই বলে না। এমনকি প্রাণ কীভাবে উৎপত্তি হলো, সে বিষয়েও কিছু বলে না; বরং কীভাবে পৃথিবীর এত বৈচিত্র্যময় প্রজাতির আবির্ভাব হলো, তা নিয়ে আলোচনা করে...**[৩]

তাছাড়া অনেকেই বিজ্ঞানের সাথে নাস্তিকতা গুলিয়ে ফেলেন, বিবর্তনকে নাস্তিকতার সমর্থক ভাবেন। এটা একেবারেই ভুল। ডারউইন নিজেও বলেছেন—

> **কোনো ব্যক্তি একই সঙ্গে বিবর্তনবাদী ও গোঁড়া আস্তিক হতে পারে। এ নিয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ আমার কাছে অবান্তর লাগে।**[৪]

তাহলে প্রশ্ন আসে, কেন তারা বিজ্ঞানের সাথে নাস্তিকতা মেলায়? অধিকাংশই মেলায় অজ্ঞতার কারণে, গুটিকয়েক মানুষ মেলায় হঠকারিতা করে। নামকরা বিজ্ঞান-দার্শনিক এলিয়ট সোবার বলেন—

---

[১] ফিতরাহ অর্থ সৃষ্টিজাত স্বভাব। এখানে স্রষ্টার প্রতি মানুষের জন্মগত বিশ্বাসকে নির্দেশ করা হচ্ছে।

[২] এ প্রসঙ্গে চমকপ্রদ আলোচনার জন্য বিস্তারিত দেখতে পারেন : রাফান আহমেদ, *অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়*, পৃষ্ঠা : ৫৪-৭০ (ঢাকা : সমর্পণ প্রকাশন, ২০১৯)

[৩] Science in the Dock, Discussion with Noam Chomsky, Lawrence Krauss & Sean M. Carroll, Science & Technology News, March 1, 2006; Retrieved from: https://chomsky.info/20060301

[৪] Belief In God And In Evolution Possible, Darwin Letter Says. The New York Times, 27 December 1981

Scanned by CamScanner

> Newtonian theory and Darwinian theory suggest to some people that there is no God. However, this is not what these theories say; it is a philosophical interpretation of those theories, one whose justification requires additional premises... we should not be astonished, when we discuss science, to find that we are actually doing philosophy.[1]

অর্থাৎ বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বই বলতে পারে না—স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে কি নেই; বরং বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সাথে আরও কিছু দর্শন/অনুমান (যেমন : বস্তুবাদ, আবদ্ধ কার্যকারণ) জুড়ে দিয়ে নাস্তিকতার জগাখিচুড়ি বানানো হয়। এই যে অতিরিক্ত মালমশলা জুড়ে দেওয়া হলো—সেটার যৌক্তিকতা, আবশ্যিকতা নিয়ে কেউ কথা বলে না। সত্য সমাগত হিসেবে ধরে নেয়। অধিকাংশ তো এটা জানেই না। ভাবে—বিজ্ঞান তো আছেই, খোদার দরকার কী? কেন এমন বালকসুলভ ভাবনা? মুক্তচিন্তা এখানে আটকে যায় কেন?

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে—বিজ্ঞানের অনুমান ও তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। নাস্তিকদের বুক ফোলানো গর্বটাও হাওয়া ছেড়ে দেওয়া বেলুনের মতো চুপসে যাবে। তাই বিজ্ঞানকে ধর্মবিদ্বেষী, বিজ্ঞানবাদী হামলাকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করতে বিজ্ঞানের দর্শন হতে পারে আমাদের সহযোগী।

[1] *Did Darwin Write the Origin Backwards*, Elliott Sober ; p. 152 (Prometheus Books, 2010)

Scanned by CamScanner

অ্যান আপিল টু কমনসেন্স

আরিফ আজাদ

অনেকেই মনে করে—বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে, ধর্ম মনে হয় ততটাই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন সব আবিষ্কার আর গবেষণার সাথে ধর্মটা বুঝি আর পেরে উঠল না। অনেক নাস্তিকও এমন ধারণা পোষণ করে মনে মনে তৃপ্তি পায়। আদতে, যেরকম ভাবা হয় বা যেরকম করে ভাবানো হয়, ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তার উল্টো। বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং আধুনিকায়নের সাথে ধর্মের আসলে কোনো সংঘাত নেই।

প্রথমে 'কমনসেন্স' দিয়েই জিনিসটাকে বোঝা যাক। একটা সুপার কম্পিউটারের কথা আমরা এখানে কল্পনা করতে পারি। মানব-সভ্যতার অন্যতম প্রধান আবিষ্কারগুলোর মধ্যে কম্পিউটার সম্ভবত একেবারে প্রথম সারির আবিষ্কার। এই কম্পিউটার আমাদের দৈনিক জীবন থেকে শুরু করে আমাদের জীবনের সবকিছুকে একদম 'ডালভাত' বানিয়ে ফেলেছে। কম্পিউটার দিয়ে আমি যেমন ফেইসবুক ব্রাউজ করতে পারি, তেমনি এই কম্পিউটার দিয়েই হাজার আলোকবর্ষ দূরের কোনো গ্রহ বা নক্ষত্রের অবস্থান, আকৃতি, কার্যকলাপ নিখুঁতভাবে নির্ণয় করে ফেলতে পারি।

যদি প্রশ্ন করা হয়—এই কম্পিউটার কে তৈরি করেছে? উত্তরটা আমাদের সকলেরই জানা—বুদ্ধিমান প্রাণী তথা মানুষ। সাম্প্রতিক বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে, সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার কম্পিউটারের চেয়েও মানুষের মস্তিষ্ক দশগুণ বেশি

Scanned by CamScanner

শক্তিশালী। আপনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়—'কম্পিউটার কে বানিয়েছে?'—তখন আপনি অকপটে উত্তর দেন, বুদ্ধিমান মানুষ। কিন্তু ওই একইভাবে আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়—সেই বুদ্ধিমান মানুষ, যার দেড় কেজি ওজনের মস্তিষ্ক সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার কম্পিউটারের চাইতেও দশগুণ বেশি শক্তিশালী, সেই মানুষটার সৃষ্টিকর্তা তাহলে কে হতে পারে?'

আপনি তখন কমনসেন্সের বালাই ভুলে গিয়ে বলতে শুরু করেন—বিলিয়ন বিলিয়ন বছর আগে কিছু রাসায়নিক পদার্থ নিজ থেকে, স্ব-উদ্যোগে একত্র হয়ে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়। যদি পুনরায় আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়—বিলিয়ন বিলিয়ন বছর আগের সেই জ্বালাও-পোড়াওময় আবহাওয়ায় কেন কিছু রাসায়নিক পদার্থের মনে হলো যে, তারা একত্র হয়ে প্রাণ তৈরি করবে? আর তাদের মনই বা কোথা থেকে এলো?' এইবার আপনি কিছু বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক 'থিওরি' কপচাতে কপচাতে কমনসেন্স, লজিক থেকে বের হয়ে 'বিচার মানি কিন্তু তালগাছ আমার' নীতিতে চলে যাবেন।

সুপার কম্পিউটার আবিষ্কারের পেছনে একজন বুদ্ধিমান সত্তার হাত থাকতে হবেই—এটা আমাদের অভ্রান্ত বিশ্বাস; কিন্তু সেই সুপার কম্পিউটারের চাইতেও অনেক বেশি শক্তিশালী 'মানব-মস্তিষ্ক'-এর ব্যাপারে আমাদের অনেকের ধারণা হলো—কিছু আবর্জনা, রাসায়নিক পদার্থ ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে এটা নিজে নিজে তৈরি হয়ে গেছে। এর পেছনে কোনো বুদ্ধিমান সত্তার হাত নেই বা থাকতে নেই।

আমরা সকলেই জানি, বিগ ব্যাংয়ের সময়ে সেই মহাবিস্ফোরণের ফলেই আমাদের মহাবিশ্বের সৃষ্টি। বিগ ব্যাং মানে কী? মহাবিস্ফোরণ। আচ্ছা, কখনো কি কোথাও বিস্ফোরণ হতে দেখেছেন? পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের কথাই ধরুন। যদি আপনাকে প্রশ্ন করি—আমেরিকা যখন জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলে, সেটাকে আমরা কি বিস্ফোরণ বলতে পারি? আচ্ছা, যদি সেটা বিস্ফোরণ হয়, তাহলে সেই বিস্ফোরণের ফলাফল কী ছিল? হিরোশিমা নাগাসাকি শহর তছনছ হয়ে গিয়েছিল নাকি আগের চেয়েও সুন্দর, মনোহর, অপরূপ হয়ে উঠেছিল?

বাস্তবতা হলো—হিরোশিমা-নাগাসাকি সেই পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরে লন্ডভন্ড হয়ে যায়। সেই পারমাণবিক বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয়তা এতই

Scanned by CamScanner

বেশি ছিল যে, সেই ভয়াবহতা এখনো ভোগ করে সেই অঞ্চলের মানুষগুলো। এখনো হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পঙ্গু-বিকলাঙ্গ সন্তান জন্ম নেয়। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের সেই রেশ এখনো গর্ভবতী মায়ের পেটে সন্তানের শারীরিক বিকৃতি ঘটায়। এই যে বিস্ফোরণ, এটা কি ক্ষতিকর না উপকারী? আমি জানি, সবাই একবাক্যে বলবে—ক্ষতিকর। দুনিয়ায় এমন একটা বিস্ফোরণের নজির কেউ দেখাতে পারবে না যেখানে কোনো বিস্ফোরণ ভালো কিছু সৃষ্টি করেছে, নতুন কিছু সৃষ্টি করেছে—যা আগের চেয়ে সুন্দর, মনোহর, উপকারী।

বিগ ব্যাংয়ের বিস্ফোরণের সাথে তুলনা করলে হিরোশিমা-নাগাসাকির সেই বিস্ফোরণ কয়েক কোটি ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগও হবে না। অথচ বিগ ব্যাংয়ের মতো এত বিশাল বিস্ফোরণের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে পৃথিবীর মতো লাইফ সাপোর্টেড একটা গ্রহ, যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষার সকল উপাদান, সকল উপকরণ একেবারে সমান অনুপাতে আছে। একটু বেশিও না, একটু কমও না। আপনার কি মনে হয়—এটা কোনো কার্যকারণ ছাড়াই, কারো কোনো পরিকল্পনা, নির্দেশনা ছাড়াই একেবারে অগোছালোভাবে তৈরি হয়ে গেছে?

মহাবিশ্বে চারটা ফোর্স (শক্তি)-এর অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে। সেগুলো হচ্ছে, Strong Nuclear Force, Weak Nuclear Force, Electromagnetic Force and Gravitational Force. এই চারটা জিনিস মহাবিশ্বের জন্মলগ্ন থেকে একেবারে ঠিক সে অনুপাতেই আছে, যে অনুপাতে থাকলে আমাদের মহাবিশ্ব অস্তিত্বে আসতে পারে। Strong Nuclear Force ঠিক যে পরিমাণে আছে, যদি তার চেয়ে এক পার্সেন্ট কম বা বেশি থাকত, তাহলে হয়তো আমাদের মহাবিশ্বে শুধু হাইড্রোজেন থাকত, অথবা একেবারে হাইড্রোজেনবিহীন হয়ে যেত। এমতাবস্থায়, সেই মহাবিশ্বে কোনোভাবেই প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব হতো না।

মহাবিশ্বের জন্মলগ্নে Weak Nuclear Force-এর পরিমাণ এখন যা আছে যদি তার চেয়ে একটু কম বা একটু বেশি হতো, তাহলে হয়তো মহাবিশ্বে খুব বেশি পরিমাণে হিলিয়াম গ্যাস তৈরি হতো, অথবা একেবারে হিলিয়াম গ্যাসবিহীন একটা মহাবিশ্ব আমরা পেতাম। এমনটা হলে কী হতো, জানেন? কোনো গ্রহই মহাবিশ্বে অস্তিত্ব লাভ করত না।

Electromagnatic Force যে পরিমাণ আছে যদি তার চেয়ে সামান্য পরিমাণ কম থাকত, তাহলে মহাবিশ্বের সব ইলেক্ট্রন হাওয়ায় মিলিয়ে যেত এবং এখানে কোনো

Scanned by CamScanner

ধরনের অণুই অস্তিত্ব লাভ করতে পারত না। আবার, Electromagnatic Force যে পরিমাণ আছে, যদি তার চেয়ে সামান্য পরিমাণ বেশি থাকত, তাহলে পরমাণু কোনো ইলেক্ট্রনকেই ধারণ করতে পারত না। ফলে কখনোই কোনো প্রকার অণুর অস্তিত্ব লাভ করা সম্ভব হতো না।

এরপর আসা যাক Gravitional Force-এর কথায়। এটা যে পরিমাণ আছে, যদি তার চেয়ে সামান্য একটু বেশি থাকত, তাহলে কী হতো, জানেন? গ্রহগুলো মাত্রাতিরিক্ত গরম হয়ে থাকত এবং সারা জীবন ধরে দাহ্য হতেই থাকত। জীবনধারণের জন্য কোনোভাবেই উপযোগী হতো না। আবার, Gravitional Force যদি সামান্য একটু কম হতো, তাহলে কী হতো? গ্রহগুলোর দাহ্যশক্তি এতই কম হতো যে সেগুলো হয়ে যেত একেবারে হিমশীতল। এরকম গ্রহও কোনোভাবে জীবন ধারণের জন্য উপযোগী হতো না।[১]

আচ্ছা, বিগ ব্যাংয়ের মতো এরকম মহাবিস্ফোরণের ফলে এই জিনিসগুলো ঠিক সেই অনুপাতে মিলে যাওয়া, যে অনুপাত হলেই জীবনধারণ এবং তার বিস্তৃতি ঘটার উপযোগী হয়—এটা কি নিছক কাকতালীয়? এই উপাদানগুলোর এরকম অবিশ্বাস্য অনুপাতে 'মিলে যাওয়া'-কে বর্ণনা করতে গিয়ে প্রয়াত পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং এভাবে বলেছেন—

> The remarkable fact is that the values of these numbers seem to have been very finely adjusted to make possible the development of Life.[২]

এই যে জীবনের উপযোগিতার জন্য এই জিনিসগুলোর এরকম নিখুঁতভাবে মিলে যাওয়া, এটার পেছনে কি কোনো বুদ্ধিমান সত্তার হাত নেই? কমনসেন্স কী বলে?

উঁহুঁ, কাহিনি এখানেই শেষ নয়। শুধু যে Strong Nuclear Force আর Weak Nuclear Force এবং Electromagnatic Force আর Gravitional Force মিলেমিশে একটা লাইফ সাপোর্টেড মহাবিশ্ব আমরা পেয়ে গেছি, তা-ই নয়; এই উপাদানগুলোর এরকম 'জাস্ট মিলে যাওয়া'র জন্য দরকার ছিল একদম ঠিক

---

[1] *The Fingerprint of God*, Hugh Ross, Page-110

[2] *A brief Histiroy of Time*, Stehen Hawking, page-125

Scanned by CamScanner

সময়ে একটা বিগ ব্যাংয়ের, অর্থাৎ একটা মহাবিস্ফোরণের। ঠিক যে সময়টায় এবং যে গতি নিয়ে বিগ ব্যাং ঘটেছিল, যদি তার চেয়ে একটু কম গতিতে বিগ ব্যাং ঘটত, তাহলে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ মাত্রা (Expanding Rate) ধীর হয়ে যেত। ফলে, মহাবিশ্বের অভিকর্ষ বলও ধীর হয়ে যেত। যদি এমনটা হতো, তাহলে আমাদের মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের বদলে নিজের মধ্যে গুটিয়ে আবার একটি বিন্দুতে এসে পরিণত হতো। বিজ্ঞানীরা এটাকে বলে 'Big Crunch'. যদি এমনটা হতো, তাহলে এই যে আপনি, আমি, এই মহাবিশ্ব, গ্রহ-নক্ষত্র, তারকারাজি—এসবের কোনোকিছুই জন্মাতে পারত না। আবার, ঠিক যে সময়টায় বিগ ব্যাং ঘটেছিল, যদি তার চেয়ে একটু সময় পরে ঘটত এবং যে গতিতে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ শুরু হয়েছিল, যদি গতির মাত্রা তার চেয়ে একটু বেশি হতো, কী হতো জানেন? মহাবিশ্ব এতই দ্রুত দৌঁড়াত যে, আমাদের বসবাস-উপযোগী কোনো গ্যাস, কোনো গ্যালাক্সি—কোনোকিছুই তৈরি হওয়ার সুযোগ পেত না।

শুধু এসবই না। আমাদের ছোট্ট পৃথিবীটাই আগাগোড়া একটা মিরাকল। সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবীর এখন যে দূরত্ব, সেটা যদি তার চেয়ে একটু বেশি হতো, কী হতো জানেন? আমাদের পুরো পৃথিবীটাই ঠান্ডা বরফে ঢেকে যেত। পুরো পৃথিবীই হয়ে উঠত এন্টার্কটিকা মহাদেশ; যেখানে কেবল পেঙ্গুইন ছাড়া আর কোনো প্রাণীই থাকতে পারত না।

আবার, পৃথিবীর অবস্থান যদি বর্তমানের চেয়ে আরেকটু কাছে হতো, তাহলে সব তো কবেই পুড়ে কাঠ-কয়লা হয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যেত।[১]

আমাদের চারপাশে ঘিরে থাকা Magnetic Field এবং সূর্য থেকে ধেয়ে আসা অতিবেগুনি রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষাকারী বায়ুমণ্ডলের 'ওজোন স্তর'-এর কথা না-হয় বাদই দিলাম। এই যে এত এত উপাদান, উপকরণ ঠিক সেই অনুপাতে 'মিলে যাওয়া'টা কি নিছক কোনো এক্সিডেন্ট? এর পেছনে কি সত্যিই কোনো মহাপরিকল্পকের হাত নেই? আপনার অবচেতন মনকে প্রশ্ন করুন।

আবার পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলো দেখুন। কেন $E = mc^2$ হলো? কেন 'প্রত্যেক ক্রিয়ারই বিপরীত একটি প্রতিক্রিয়া' থাকতে হবে? শক্তির নিত্যতা সূত্র, থার্মোডাইনামিক্সের

---

[1] Davies, Paul. The Cosomic Blueprint. (New York : Simon and schuster, 1988, Page. 203)

Scanned by CamScanner

সূত্রগুলো কেন ঠিক সেরকম, যেরকম আমাদের দরকার? এর ব্যত্যয় নেই কেন কোথাও? আমরা এসব সূত্রের কাজ সম্পর্কে জানি; কিন্তু এসব সূত্র ঠিক কোত্থেকে এসেছে? ঠিক এই প্রশ্নটাই রেখেছেন এক সময়কার সবচেয়ে ইনফ্লুয়েন্সিভ নাস্তিক Antony Flew. তিনি বলেছেন, 'Then, who wrote the laws of nature?'[১]

সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন মূলত এটাই। বিজ্ঞান আমাদের সূত্রগুলোর কাজ জানাতে পারে, কিন্তু এর উৎসমূল সম্পর্কে জানাতে পারে না। আরও চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের অস্তিত্ব। বিজ্ঞান মহলে সুবিদিত চ্যালেঞ্জিং প্রশ্নটাই হচ্ছে— Why there is something rather than nothing?' কেন কোনোকিছু না থাকার বদলে কোনোকিছু আছে? এই পৃথিবী, এই মহাবিশ্ব, এই গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা, সাগর-মহাসাগর এসব তো সৃষ্টি না হলেও পারত। কেন হলো? এর পেছনে রহস্য কী? আপাত এই সাধারণ প্রশ্নটাই যুগ যুগ ধরে অমীমাংসিত অবস্থায় থেকে গেছে।

বিবর্তনবাদ তত্ত্ব এসে মাঝখান দিয়ে বিজ্ঞানের অন্দরমহল থেকে ধর্ম আর স্রষ্টাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিতে চাইল। চার্লস ডারউইন এসে বললেন, আমরা আসলে কোনো নির্দিষ্ট মানব-মানবী থেকে জন্মাইনি। আমাদের আদিপুরুষ একটি এককোষী ব্যাকটেরিয়া মাত্র। সেই একটি এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে বিবর্তিত হতে হতে আমরা আজকের আধুনিক মানুষে এসে ঠেকেছি।

বিজ্ঞান-জগতের টুঁটি চেপে ধরা বস্তুবাদী বিজ্ঞান-দর্শনের মূলনীতিই হলো— স্রষ্টাতত্ত্বকে কোনোভাবেই তারা বিজ্ঞান মহলে প্রবেশ করতে দেবে না। ফলে, যখনই কোনো বিজ্ঞানী, কোনো গবেষক বিবর্তনবাদ তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বা করেছে, তাকে বরণ করে নিতে হয় অপমান-লাঞ্ছনা আর চাকরি থেকে বহিষ্কার। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া জার্মান বিজ্ঞানী গুন্টার বেকলিই তার উদাহরণ।[২]

সুতরাং, বিজ্ঞান কখনোই ধর্মবিরোধী হয় না, আর না প্রকৃতধর্ম কখনো বিজ্ঞানবিরোধী হয়। বিজ্ঞান নির্ভর করে প্রকৃতির ওপর। প্রকৃতি চলে তার সুনির্দিষ্ট 'ল' অনুসারে।

---

[1] From the 5th headline of great book of Antony flew *There is a God : How the world's most notorious atheist changed his mind.*

[2] https://www.google.com/amp/s/www.haaretz.com/amp/science-and-health/scientist-comes-out-against-evolution-loses-wikipedia-page-1.5466166

Scanned by CamScanner

আর প্রকৃতির সেই Law-গুলো তো মহান আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। তাহলে, এতে কী করে বিরোধ হতে পারে?

যারা আপনার সামনে বিজ্ঞানকে ধর্মের বিপক্ষে হাজির করে, তারা আপনাকে অর্ধসত্য বিজ্ঞান শেখায়। এরা না নিজেরা ঠিকঠাক কিছু জানে, না এরা ঠিকঠাক কোনোকিছু জানাতে পারে। বিজ্ঞান এবং স্রষ্টার ব্যাপারে বলতে গিয়ে আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের জনক লুই পাস্তুর বলেছেন—'The more I study nature, the more I stand amazed at the work of the Creator. Science brings men nearer to God.'[১]

বিজ্ঞানচর্চা কখনোই কাউকে ধর্মবিরোধী করে তোলে না। যারা বিজ্ঞানের ধোঁয়া তুলে ধর্মবিরোধী সাজে, এরা মূলত নিজেদের 'নফস'-কে প্রাধান্য দেয়। ধর্মের অধীন হতে হলে তাকে কিছু 'রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন'-এর মধ্য দিয়ে যেতে হবে; কিন্তু ভোগবাদী দুনিয়ার মোহে এসব রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন মানতে সে রাজি নয়। সে অবশ্যই বিশ্বাস করে, তার চারপাশের প্রকৃতি, তার দৃষ্টিগোচরের সবকিছুই একটা নিয়ম মেনে চলে। তার কমনসেন্স তাকে এটাও বলে, যেখানেই কোনো 'রুলস' থাকে, 'নিয়ম' থাকে, Law থাকে, সেখানেই একজন 'Law-Giver' থাকাও আবশ্যক। সে জানার পরও অস্বীকার করে। কারণ, তারা নিজেদের প্রবৃত্তিকেই নিজেদের 'রব' বানিয়ে নিয়েছে।

[1] Cited from 'The literary digest', 18 march, 1902

Scanned by CamScanner

আল্লাহর অস্তিত্ব : কুরআনের আর্গুমেন্ট

মুহাম্মাদ আল বান্না

তারা কি আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না।[১]

কুরআনের এ আয়াত দুটি আমাদেরকে আল্লাহর অস্তিত্বের একটি শক্তিশালী এবং ইন্টুইটিভ (intuitive) আর্গুমেন্টের সামনে দাঁড় করায়। কুরআন এখানে 'خُلِقُو' শব্দটি ব্যবহার করেছে। সুতরাং এই আর্গুমেন্টটি 'যা কিছু অস্তিত্বের মধ্যে' অর্থাৎ যা কিছু সৃষ্ট, সেই সকল বস্তুর ওপরই প্রয়োগ করা যায়। আর্গুমেন্টটিকে যদি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, কুরআন এখানে কোনো কিছু সৃষ্টি হওয়ার কয়েকটি সম্ভাব্য উপায় বলছে—

কোনো স্রষ্টা ছাড়া আপনা-আপনি সৃষ্টি : 'তারা কি আপনা-আপনিই সৃষ্ট হয়েছে?'

নিজেরাই নিজেদের অস্তিত্বে আনা : 'তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা?'

আপনা-আপনিও নয়, নিজেরাও নয়; বরং মহান কোনো সত্তার সৃষ্টির কারণে অস্তিত্বে আসা : 'তারা কি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা

---

[১] সুরা তুর, আয়াত : ৩৫-৩৬

Scanned by CamScanner

দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না।' এখানে কুরআন বলছে, তারা আসমান-জমিন কোনো কিছুই সৃষ্টি করেনি। বাস্তবতা হলো—তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মহান এক সত্তা, কিন্তু তারা তা বিশ্বাস করে না।

এখন আমরা কুরআনের আয়াতগুলো থেকে বেরিয়ে একটি ইউনিভার্সাল আর্গুমেন্ট দাঁড় করাব ইনশা আল্লাহ।

এক. মহাবিশ্ব সসীম।

দুই. সসীম মহাবিশ্বকে অবশ্যই অস্তিত্বে আসতে হবে। কুরআন অনুযায়ী সম্ভাব্য তিনটি উপায় হলো[১]—

» শূন্য থেকে আপনা-আপনি হবে।

» নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করবে।

» এমন এক সত্তা থেকে আসবে—যিনি কিনা নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনো সত্তার ওপরে নির্ভরশীল নন, অর্থাৎ একজন নেসেসারি বিয়িং।

তিন. শূন্য থেকে কিংবা নিজেই নিজেকে সৃষ্টির মাধ্যমে মহাবিশ্ব অস্তিত্বে আসতে পারে না।

চার. সুতরাং, মহাবিশ্বের অস্তিত্বে আসার কারণ হচ্ছে—অমুখাপেক্ষী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা।

মহাবিশ্ব কি সসীম?

আজ থেকে প্রায় ২৪০০ বছর পেছনে প্রাচীন গ্রিস থেকে একটু ঘুরে আসা যাক। পথে হয়তো লাইসিয়াম থেকে আসা কিংবা এপিকিউরিয়ানদের বাগান থেকে বের হওয়া কারো সঙ্গে দেখাও হয়ে যেতে পারে। তাকে যদি প্রশ্ন করেন 'এই মহাবিশ্ব কোথা থেকে অস্তিত্বে এলো?' তাহলে সে হয়তো আপনাকে বোকা মনে করে উত্তর দিত—'আরে মিয়া, এসব কী বলেন? মহাবিশ্বের আবার শুরু আছে নাকি?

---

[১] *তাফসিরুর রাজি*, খণ্ড : ২৮; পৃষ্ঠা : ২১৬; *তাফসিরুস সাদি*, পৃষ্ঠা : ৮১৬

Scanned by CamScanner

এটা তো অসীমকাল থেকেই আছে। এর আবার অস্তিত্বে আসতে হবে কেন?'

যেমনটা এরিস্টটল মনে করতেন, মহাবিশ্বে অন্য সবকিছু বিরাজমান পদার্থ থেকেই তৈরি হয়। ধরা যাক, আপনি একটি বাড়ি বানাবেন। বাড়ি বানাতে আপনার প্রয়োজন ইট, বালু, সিমেন্ট-সহ আনুষঙ্গিক আরও অনেক কিছু। এই বস্তুগুলো কিন্তু মহাবিশ্বেরই অংশ। এদেরকে এরিস্টটল বলতেন 'Substratum'। আর তিনি মনে করতেন, এই সাবস্ট্র্যাটাম হলো 'ইটারনাল' অর্থাৎ অনন্তকাল ধরেই আছে; এর কোনো শুরু নেই!

আচ্ছা ঠিক আছে, কষ্ট করে এত পেছনেও যেতে হবে না। এই ধরেন, ফিলোসফার বার্ট্রান্ড রাসেলকেই জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি যা বলতেন, তা হলো—

> The universe is just there, and that's all.[১]

কিন্তু থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্রটি সব সময় মহাবিশ্বের একটি শুরুর দিকে ইঙ্গিত দেয়। এই নীতি বলে, কোনো একটি বন্ধ ব্যবস্থা (Closed System) সব সময় একটি সাম্যাবস্থার দিকে এগোয়। অর্থাৎ, সময়ের সাথে সাথে এন্ট্রপি বেড়ে একটি তাপীয় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। সুতরাং, আমাদের মহাবিশ্ব যেহেতু সম্মিলিতভাবে একটি বন্ধ ব্যবস্থা, তাই অসীমকাল থেকে এর অস্তিত্ব থাকলে এটি এখন তাপীয় মৃত্যুর অবস্থায় থাকত। আপনি এই লেখা পড়ার জন্য এখানে থাকতেন না কিংবা আমি এই লেখা লেখার জন্যও হয়তো থাকতাম না। যা-ই হোক, এখানে আমরা কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে এগোবো না। কারণ, এখন পর্যন্ত প্রায় ১৭টির মতো কসমোলজিকাল থিওরি রয়েছে, যেখানে কিছু তত্ত্ব বলে মহাবিশ্ব চিরস্থায়ী (eternal), আবার কিছু তথ্য বলে মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট শুরু রয়েছে।

এক্ষেত্রে আমরা কিছু অ্যানালজি দেখব যে, মহাবিশ্ব আসলেই অসীম হতে পারে কি না। প্রকৃতপক্ষেই কি বিচ্ছিন্ন ভৌতজগতে (Discrete physical world) অসীম (Actual infinity) থাকতে পারে? অসীমতাকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

---

[1] *Bertrand Russell and F.C. Copleston, "The Existence of God," in The Existence of God, ed. with an Introduction,* John Hick, Problems of Philosophy Series (New York : Macmillan & Co., 1964), p. 175.

Scanned by CamScanner

প্রথমত, আনডিফারেন্সিয়েটেড অসীম। অর্থাৎ যা ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যায় না এমন কিছুর অসীমতা। যেমন স্রষ্টার অসীমতা।

আর অন্য ধরনের অসীমতা হচ্ছে, অসীমতাকে ভৌতজগতের কোনো কিছুর ওপরে আরোপ করা। যে সকল বস্তুকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যায়, তাদের ওপরে আরোপ করা। সেটা হতে পারে মহাবিশ্বের কোনো বস্তুর ওপরেই। প্রথম ধরনের অসীমতা থাকা সম্ভব; কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের অসীমতা থাকা কি আদৌ সম্ভব? অর্থাৎ, প্রকৃত অসীম থাকা কি সম্ভব?

কয়েকটি উদাহরণ দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, প্রকৃত অসীম থাকা একেবারেই অসম্ভব।

একটি ব্যাগ কল্পনা করুন, যেখানে অসীমসংখ্যক বল রাখা আছে। এখন, যদি আপনি ব্যাগ থেকে দুটি বল সরিয়ে ফেলেন তাহলে ব্যাগে কয়টি বল থাকবে? গাণিতিকভাবে এখনো অব্দি অসীমসংখ্যক বলই ব্যাগে আছে; কিন্তু যা ছিল তার থেকে দুটি কম। এবার যদি আপনি দুটি বল ব্যাগে যোগ করে দেন তাহলে কয়টি বল ব্যাগে থাকবে? যা ছিল তার থেকে দুটি বেশি। মানে অসীম থেকে দুই বেশি? অসম্ভব! আপনি ব্যাগ থেকে বলগুলো বের করে গুনে দেখতে পারেন; কিন্তু আপনি কখনোই অসীমসংখ্যক বল গুনতে পারবেন না। কারণ, অসীম কেবল একটি ধারণা মাত্র। বস্তুজগতে এর কোনো অস্তিত্বই নেই। আর এ কারণেই, বিখ্যাত জার্মান গণিতবিদ ডেভিড হিলবার্ট (David Hilbert) বলেছিলেন—

> 'The infinite is nowhere to be found in reality. It neither exists in nature nor provides a legitimate basis for rational thought...the role that remains for the infinite to play is solely that of an idea.'[১]

কিছু কিউবের কথা চিন্তা করুন। প্রথম কিউবটি ১০ ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের। এবার এর ওপরে এর অর্ধেক আয়তনের একটি কিউব রাখুন। এভাবে আবার দ্বিতীয় কিউবের অর্ধেক আয়তনের আরেকটি কিউব এর ওপর রাখুন। এভাবে রাখতেই থাকুন। কিউব রাখতে রাখতে অসীমসংখ্যক কিউব রাখুন। এবার সবচেয়ে ওপরের

---

[1] *David Hilbert. On the Infinite, in Philosophy of Mathematics, ed. with an Intro.* by P. Benacerraf and H. Putnam. Prentice-Hall. 1964, page151.

Scanned by CamScanner

কিউবটি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। সেখানে কি কোনো কিউব আছে? ধরা যাক, আছে এবং আপনি সেটি সরিয়েও ফেললেন। তা-ই যদি হয়, মানে সবচেয়ে ওপরে যদি একটি কিউব থাকে, তাহলে কী দাঁড়াল? এটাই দাঁড়াল যে, কিউবের টাওয়ার কখনোই অসীমে পৌঁছায়নি। আর সবচেয়ে ওপরে যদি কোনো কিউব না পাওয়া যায়, তবুও কিউবের টাওয়ারটি কখনোই অসীমে পৌঁছাতে পারেনি। এর মানে discrete physical things কখনোই অসীম হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও ওপরে বলা ব্যাগের বলগুলো আর কিউবগুলো থেকে ভিন্ন কিছু নয়। এই মহাবিশ্ব যৌক্তিকভাবে সসীম এবং অবশ্যই এর একটি শুরু থাকতে হবে।

শূন্য থেকে আপনা-আপনি সৃষ্টি

শূন্য থেকে আপনা-আপনি কিছু কি সৃষ্টি হতে পারে? এর উত্তর আমরা আমাদের ইনটুইশান (intuition) থেকে কোনো দ্বিধা ছাড়াই দিয়ে দিতে পারি—'না'। মেটাফিজিক্যললি—Being can't come from nonbeing. তবে, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পরম শূন্যতা আর কোয়ান্টাম শূন্যতা এক বিষয় নয়। কোয়ান্টাম শূন্যতা কখনোই পরম শূন্যতা নয়। কোয়ান্টাম শূন্যতায় ভ্যাকুয়াম অ্যানার্জি থাকে। সুতরাং, এটা নাথিং নয়, সামথিং। পরম শূন্যতায় কোনো স্থান, কাল, শক্তি এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো কার্য-কারণ (Cause and effect) থাকবে না। এমন শূন্যতা থেকে কিছু অস্তিত্বে আসা সম্ভব নয়। এমনটা হলে, যে কেউই যা ইচ্ছে তা-ই করে বসতে পারে। যেমন—বিশাল ভবন টুপ করে নাই হয়ে যেতে পারে, হঠাৎ যেকোনো কিছু অস্তিত্বে চলে আসতে পারে। ব্যাপারটা কতটা আষাঢ়ে ও অযৌক্তিক ভাবুন তো একবার! সুতরাং, পরম শূন্যতা, যেখানে কোনো causal condition নেই, এমন কিছু থেকে মহাবিশ্ব অস্তিত্বে আসতে পারে না।

নিজেই নিজেকে সৃষ্টি

নিজেই নিজেকে অস্তিত্বে আনা কি সম্ভব? কোনো কিছু অস্তিত্বে আসতে হলে তার পেছনে পূর্ব থেকে বিরাজমান একটি কারণ লাগে (pre-existing cause)। ধরা যাক B-কে অস্তিত্বে আসতে হলে A-এর প্রয়োজন হবে। এখানে A-কে অবশ্যই B-এর আগে থেকে অস্তিত্বে থাকতে হবে। B নিজেকে নিজে কখনোই সৃষ্টি করতে পারবে না। কারণ, তা করতে হলে B-কে আগে থেকেই অস্তিত্বে

Scanned by CamScanner

থাকতে হবে। আর B যদি আগে থেকেই অস্তিত্বে থেকে থাকে, তবে তার আর অস্তিত্বে আসার প্রয়োজন নেই। সুতরাং, মহাবিশ্ব নিজেই নিজেকে তৈরি করতে পারবে না।

কে সৃজিল তবে এ নিখিল মহাবিশ্ব?

সুমহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন—

.....

বরং তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না।[১]

.....

কুরআনের করা এই আর্গুমেন্ট অনুযায়ী মহাবিশ্ব আপনা-আপনিই অস্তিত্বে আসেনি, আবার নিজেও নিজেকে সৃষ্টি করেনি; বরং নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর সৃষ্টি। যদিও অবিশ্বাসীরা তা বিশ্বাস করতে চায় না।

এখানে, এই প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ নেই যে—'স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল?' কারণ, তিনি হলেন একজন নেসেসারি বিয়িং, যিনি নিজে সৃষ্ট নন এবং অন্য কোনো সত্তার ওপর নির্ভরশীলও নন। সংগত কারণেই এমন একজন সত্তার অস্তিত্ব আমাদের স্বীকার করতেই হবে। নয়তো আমাদের এ মহাবিশ্বের অস্তিত্বে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ত। একটু বুঝিয়ে বলি—

ধরে নিই, মহাবিশ্বের সৃষ্টির জন্য U1 দায়ী। এখন এই U1 নিজেই যদি সৃষ্ট হয়ে থাকে বা 'contingent' হয়ে থাকে, অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বের জন্য একে অন্য কোনো সত্তার ওপরে নির্ভর করতে হয়। ধরা যাক, সেই কারণটি হলো U2। এবার U2-এরও যদি একই অবস্থা হয়, তাহলে এই কজ অ্যান্ড ইফেক্টের চেইন অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে। আর এটা অসম্ভব। এটা যদি সম্ভব হতো, তবে মহাবিশ্ব কখনোই অস্তিত্বে আসত না।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। অনেক সময় তত্ত্বকথার চেয়ে উদাহরণ আর অ্যানালজি অনেক বেশি কার্যকর হয়।

---

[১] সুরা তুর, আয়াত : ৩৬

Scanned by CamScanner

কল্পনা করুন, একজন স্নাইপার শুট করার জন্য তার পেছনে এক কমান্ডারের আদেশের অপেক্ষায় আছে। সেই কমান্ডার আবার তার পেছনে দাঁড়ানো অন্য এক কমান্ডারের আদেশের অপেক্ষায় আছে। তার পেছনে রয়েছে আরেকজন। এভাবে চলতে থাকলে অসীম পর্যন্ত কমান্ডারের চেইন চলতে থাকবে (infinite regress)। এর মানে হলো, ওই স্নাইপার কোনোদিনই তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা কমান্ডারের আদেশ পাবে না আর গুলিও করতে পারবে না। সুতরাং, এই সম্ভাবনাও অসম্ভব।

সুতরাং, কুরআনের আর্গুমেন্ট অনুযায়ী মহাবিশ্ব নিঃসন্দেহে এমন এক সত্তার সৃষ্টি, যিনি সৃষ্টও নন এবং কারো ওপর নির্ভরশীলও নন। এখানে, এই প্রশ্ন করারও কোনো সুযোগ নেই যে, চেইনের সেই শেষ কারণটি মহাবিশ্ব নিজেই নয় কেন? এর উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে, মহাবিশ্ব contingent এবং সসীম concrete being। আর এটা অসীমকাল থেকে থাকতে পারে না। পরে সসীমকালে এসে তার অস্তিত্ব তৈরি হয়। সুতরাং এটা কখনো চেইনের শেষ কারণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।[১][২]

[1] This argument has been inspired by and adapted from Idris, J. (1994) The Contemporary Physicists and God's Existence. Available at : http : //www.jaafaridris.com/the-contemporary-physicists-and-gods-existence/
[Accessed 23rd November 2016].

[২] http : //www.hamzatzortzis.com/the-qurans-argument-for-gods-existence/#_edn3

Scanned by CamScanner

হিউম্যান : মানব না দানব?

ডা. শামসুল আরেফীন শক্তি

প্রায়ই ভাইয়েরা প্রশ্ন করেন, তাদের কোনো ভাই বা বন্ধু দ্বীনের দিকে ঝুঁকছেন, কোন বই পড়তে দেবেন? অনেক ভাইবোন কমেন্টে বিভিন্ন প্রকাশনীর কুরআনের তরজমা সাজেস্ট করেন। কিংবা অনেক ভাই-ই দ্বীনের পথচলা শুরু করেন কুরআনের তরজমা দিয়ে। নিঃসন্দেহে কুরআনই তো আমাদের চিন্তাচেতনার মূল কেন্দ্র, মূলসূত্র; কিন্তু দ্বীনের জ্ঞান অর্জন কুরআন দিয়ে শুরু করার ব্যাপারে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

আমার একজন পরিচিত ব্যক্তি। হজ করে এসে দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করা শুরু করলেন। কিছুদিন পর আমাকে কথায় কথায় বললেন, তিনি কুরআনের তরজমা পড়ছেন। তবে সমস্যা হলো, তিনি নাকি বিয়েতে স্ত্রীর জন্য মোহর নির্ধারণ আর যৌনকর্মীর পারিশ্রমিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাননি!

আরেকজন কাছের মানুষ। কুরআনের তরজমা দিয়ে তিনিও শুরু করেছেন। তার অনুভূতি হলো—বর্তমান ইসলাম হলো উগ্রবাদ, মোল্লাদের তৈরি। কুরআনের ইসলাম এত কঠিন না।

এরকম বহু নজির আপনার আশপাশেই পাবেন। সব ভ্রান্ত ফিরকা নিজেদের মতো করে কুরআন থেকেই দলিল দেয়। আবার, শুধু কুরআনের ওপর ভিত্তি করে ভ্রান্ত দলের অস্তিত্বও আমাদের অজানা নয়। আচ্ছা, কেন এমন হয়? সাহাবিদের প্রথম

Scanned by CamScanner

শিক্ষা তো কুরআনই ছিল, তারা তো বিভ্রান্ত হননি।

দুটো কারণ আছে এমনটা হওয়ার—

প্রথমত, কুরআন বুঝিয়ে দেওয়ার কেউ থাকতে হবে। সাহাবিগণকে কুরআন বুঝিয়ে দিতেন খোদ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এভাবে প্রতি প্রজন্মে এই বুঝটা ট্রান্সফার হয়েছে। এই ধারাবাহিক কমন বুঝটার বাইরে নিজের মতো করে বুঝতে গিয়েই সমস্যাগুলো হয়েছে। কেউ একজন থাকতে হবে, যিনি কিনা আমাকে এই আদি ব্যাখ্যা (নবিজি ও সাহাবিগণের বুঝটুকু) আমাকে বুঝিয়ে দেবেন। এটা সত্যি যে, ব্যস্ততার দরুন এমন কারো কাছে বসে কুরআন পড়ে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এর একটা সমাধান হতে পারে কোনো সহজ তাফসির (ব্যাখ্যা-সহ তরজমা) নেওয়া এবং পড়ার সময় কোনো জায়গা না বুঝলে টুকে নেওয়া। সেগুলো নিয়ে কোনো আলিমের কাছে সুবিধাজনক সময়ে বসে ক্লিয়ার হয়ে নেওয়া। শুধু তরজমা পড়াকে এজন্যই নিরুৎসাহিত করা হয়। কারণ, প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা ভালো না। আর দ্বীনের 'পয়লা পাঠ' হিসেবে তো আমি সরাসরি নিষেধই করব।

আর দ্বিতীয় কারণ হলো, আমরা জেনারেল কারিকুলামে পড়াশোনা করেছি। যেটা ব্রিটিশ-প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা-কাঠামো। এই উপমহাদেশের ট্র্যাডিশনাল শিক্ষাধারাকে পরিবর্তন করে নতুন শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। কেমন ছিল ভারতের ব্রিটিশ-পূর্ব শিক্ষাব্যবস্থা, তা সম্পর্কে কট্টর ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার জানাচ্ছেন—

> **...ভারতীয় মুসলিমদের এমন একটা শিক্ষাপ্রণালি ছিল, যেটা আমাদের আমদানি করা (ব্রিটিশ) প্রণালির চেয়ে নিম্ন হলেও (!) কোনোক্রমেই ঘৃণার যোগ্য ছিল না। তার দ্বারা উচ্চস্তরের জ্ঞান বিকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচ্ছন্ন হতো। সেটা পুরনো ছাঁচের হলেও তার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় ছিল এবং সেকালের অন্য সব প্রণালির চেয়ে নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট ছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থায়ই তারা মানসিক ও আর্থিক প্রাধান্য সহজেই অধিকার করেছিল।**[১]

---

[১] *ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, উইলিয়াম হান্টার, পৃষ্ঠা : ১১৬

Scanned by CamScanner

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় ৮০ হাজার মক্তব ও মাদরাসা ছিল,[১] যেখানে উইলিয়াম হান্টারের বিবরণ অনুযায়ী 'ব্রিটিশ কারিকুলামের মতো না হলেও ঘৃণার যোগ্য ছিল না', বরং 'উচ্চস্তরের জ্ঞান বিকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচ্ছন্ন' হওয়ার জন্য এবং 'মানসিক ও আর্থিক প্রাধান্য' অর্জনের উপযোগী ৮০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল আমাদের ৩ বা ৪ কোটি মানুষের জন্য।

কিন্তু এই শিক্ষাব্যবস্থা ব্রিটিশদের উপনিবেশী চাহিদা পূরণের জন্য অনুকূল ছিল না। মসনদ টিকিয়ে রাখার জন্য চাই এমন শিক্ষা দেওয়া, যাতে প্রভুভক্ত নেটিভ তৈরি হয়। এমন এক প্রজন্ম তৈরি করা—'যারা রক্তে আর গায়ের রঙে তো ভারতীয়, কিন্তু রুচি-মতামত-নীতি-বিচারবুদ্ধিতে হবে ইংরেজ।' যারা হাজার মাইল দূরের থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা ভিনজাতি, ভিনধর্ম, ভিনসংস্কৃতির শোষণকে আশীর্বাদ হিসেবে মেনে নেবে। সেই লক্ষ্যে ১৮৩৪ সালে ভারতে শিক্ষা প্রসারের জন্য কমিটি করা হয়। কমিটির প্রধান লর্ড মেকেলে নতুন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন—

'বর্তমানে এমন একটি শ্রেণি তৈরি করার জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত, যারা আমাদের ও আমাদের মিলিয়ন মিলিয়ন প্রজাদের মধ্যে ভাষ্যকার হিসেবে কাজ করবে। (উদ্দেশ্য কিন্তু শিক্ষার প্রসার না)

এরা হবে এমন একটা শ্রেণি, যারা রক্তে আর গায়ের রঙে তো ভারতীয়, কিন্তু রুচি-মতামত-নীতি-বিচারবুদ্ধিতে হবে ইংরেজ। (মনোরাজ্যে উপনিবেশ)

এই শ্রেণির কাছে আমরা দায়িত্ব দেবো তাদের দেশে প্রচলিত কথাগুলোকে সংস্কার করার এবং পশ্চিমা পরিভাষা নিয়ে তাদের স্থানীয় ভাষাগুলোকে সমৃদ্ধ করার। (পশ্চিমা দর্শন-সংজ্ঞা-পরিভাষা গ্রহণ ও আত্মীকরণ)

তাদেরকে আমরা বাহন হিসেবে দেবো বিভিন্ন ডিগ্রি, যাতে চড়ে তারা এই জ্ঞান পৌঁছে দেবে বাকি জনগণকে।'[২] (যেমন : ডক্টরেট, নোবেল প্রাইজ, স্যার, রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর)

---

[১] *এ জেড এম শামসুল আলম*, মাদ্রাসা শিক্ষা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, চট্টগ্রাম-ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ : মে-২০০২, পৃষ্ঠা : ৩-৪

[২] স্কীমের রিপোর্ট Minute on Indian Education, 2nd February, 1935; Thomas Babington Macaulay, point 12

Scanned by CamScanner

পশ্চিমা শিক্ষা-দর্শনের একটা উদ্দেশ্যই হলো, 'পাশ্চাত্য সভ্যতার মহান ধারণাগুলো (এনলাইটেনমেন্ট থেকে পাওয়া) যেন বুঝিয়ে দেওয়া যায় শিক্ষার্থীদের। কেননা, এই আইডিয়াগুলো চিরন্তন, ধ্রুব সত্য এবং সর্বযুগের সমাধান।'[১]

এভাবেই ইউরোপের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে 'সার্বজনীন পরম সত্য' হিসেবে পুরো দুনিয়ার ওপর চাপানোর এজেন্ডা নেওয়া হলো। যদিও ইসলামি ভূখণ্ডে, চীনে, আফ্রিকার অভিজ্ঞতা ইউরোপ থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। উপনিবেশের মওকায় এভাবেই তারা সেই শ্রেণিটা তৈরি করে ফেলল—'যারা চামড়ায় ভারতীয়, মগজে ইউরোপীয়।'

যেহেতু শিক্ষার সংজ্ঞা হলো ইউরোপের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি শেখা, ধারণ করা ও আত্মীকরণ করে চামড়ায় ভারতীয় মগজে ইউরোপীয় হওয়া'। এই সংজ্ঞায় যারা পড়বে তারা হলো 'শিক্ষিত'। ঠিক এই শ্রেণিটাই ইংরেজ খেদানোর পর ক্ষমতায় বসেছে, পলিসি করেছে, দেশ চালিয়েছে, বই লিখেছে। শুধু এরাই শিক্ষিতশ্রেণি, আর যারা এই সংজ্ঞায় এলো না, তারা 'অশিক্ষিত', 'মূর্খ', 'প্রস্তর যুগের লোক', 'পশ্চাদপদ'। ফলে ইংরেজ চলে গেলেও, ইংরেজের রুচি-মতামত-নীতি-বিচারবুদ্ধিতেই আমরা উঠছি-বসছি-চলছি-ফিরছি-শিখছি। জেনারেশনের পর জেনারেশন আমরা বেড়ে উঠছি 'রঙে ভারতীয় ঢঙে ইংরেজ' হয়ে। প্রজন্মান্তরে জন্ম নিচ্ছি আমরা লর্ড মেকেলের বুদ্ধিজাত সন্তান হিসেবে।

আর ইংরেজ এবং ইউরোপীয়দের চিন্তাচেতনার উৎস হলো—গ্রিকদের বিশ্বদর্শন আর রোমানদের সমাজ-রাষ্ট্রবোধ। ১৪ শতকে রেনেসাঁর সময় থেকে শুরু হয় খ্রিষ্টধর্মের খোলস থেকে বেরিয়ে আসার এই প্রক্রিয়া। শেষ হয় ১৮ শতকে এনলাইটেনমেন্টে এসে। তারা এই উপনিবেশবাদের সুযোগে স্বাধীনতা-সমতা-নৈতিকতা-নিরপেক্ষতা-প্রকৃতিবাদ—এসব চিন্তা-দর্শন দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে। এগুলো শিখিয়ে তারা তৈরি করেছে এমন এক শ্রেণি, যারা কিনা চিন্তা ও মননে ইউরোপীয়। সেই শ্রেণিটাই আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের চিন্তাকে গড়ে তুলেছে,

---

[১] Perennialism দর্শন।

[Philosophical Perspectives in Education,Oregon State University ওয়েবসাইট]

'to ensure that students acquire understandings about the great ideas of Western civilization. These ideas have the potential for solving problems in any era. The focus is to teach ideas that are everlasting, to seek enduring truths which are constant, not changing, as the natural and human worlds at their most essential level, do not change.

Scanned by CamScanner

আর তারা গড়েছে আমাদের। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, প্রজন্মান্তরে আমরা সেই চিন্তাধারাই বহন করি। সুতরাং, পশ্চিমা চশমা পরে যখন কেউ কুরআন পড়ে, তখন একের পর এক প্রশ্ন জাগতে থাকে মনে। কেন মেয়েরা অর্ধেক সম্পত্তি পেল? কেন মেয়েদের সাক্ষীর দাম ছেলেদের অর্ধেক? কেন আল্লাহ যুদ্ধ করতে বললেন? কেন চার বিয়ের অনুমতি? কেন দাসদাসীর বিধান? কেন এই, কেন সেই? খুব স্বাভাবিক। কেননা, এই ইউরোপীয় মানদণ্ড প্রতি গিঁটে গিঁটে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এই ইউরোপীয় মূল্যবোধ বা ধারণাগুলোকে ওরা আমাদের 'চূড়ান্ত' 'ধ্রুব' 'সর্বৈব সত্য' 'নিপাতনে সিদ্ধ' ভাবতে শিখিয়েছে।

ফলে আল্লাহর দেওয়া দ্বীন, আল্লাহর স্ট্যান্ডার্ডকে আমাদের কাছে বর্বর বলে মনে হয়, মধ্যযুগীয় বলে মনে হয়, সেকেলে মনে হয়। দুটো মাপকাঠির পার্থক্য দেখুন। একটা হলো গ্রিক-রোমান-প্যাগানদের চিন্তাদর্শন 'নতুন বোতলে পুরোনো মদ'। আরেকটা হলো স্বয়ং স্রষ্টা, স্বয়ং অধিপতি পালনকর্তার প্রদত্ত, যিনি মানবমন-মানবসমাজ-মানবদেহের গতিপ্রকৃতি খোদ সৃষ্টি করেছেন। আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা স্রষ্টা এবং সৃষ্ট সম্পর্কে জেনেছি। তাহলে সৃষ্টি সম্পর্কে কে বেশি অবগত—স্রষ্টা নাকি সৃষ্ট। অথচ, আজ আমরা মানবদর্শনের স্কেলে প্রশ্ন করছি আল্লাহর সিদ্ধান্তকে। আজ ইসলাম নিয়ে নাস্তিকদের যত প্রশ্ন, মডার্নিস্ট রিভিশনিস্ট, মডারেট মুসলিমদের যত হীনমন্যতা—সব কিছুরই উৎস এই পাশ্চাত্য মাপকাঠি ও পাশ্চাত্য ধারণাগুলোকে 'চূড়ান্ত' ঠাওরানোর প্রবণতা। এটাই সব প্রশ্নের, সব আপত্তির উৎস।

কুরআন থেকে হিদায়াত পেতে হলে সবার আগে এই ব্রিটিশ-ওয়াশ মগজখানি কাউন্টার ওয়াশ দিয়ে নিউট্রালে আনতে হবে। নিউটনের বলবিদ্যার সূত্র এবং পশ্চিমের অর্থনীতি-রাষ্ট্রবিজ্ঞান-সমাজবিজ্ঞানের ধারণাগুলোকে এক নিক্তিতে মাপা যাবে না। তাদের সামাজিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো কোনো প্রশ্নাতীত বিষয় নয়। তাদের পুরো সামাজিক বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে একটা সংজ্ঞার ওপর—ব্যক্তি, হিউম্যান। human, person, individual—এগুলোর দার্শনিক যে সংজ্ঞা, তার ওপরেই পরিবারের সংজ্ঞা, সমাজের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, অর্থনীতির সংজ্ঞা, আইনের সংজ্ঞা, অধিকার-স্বাধীনতা-সমতা-নৈতিকতা সবকিছুর ধারণা। পুরো পশ্চিমা সভ্যতা এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাই, পশ্চিমা চিন্তা-মনন বুঝতে হলে এই human-এর সংজ্ঞাটা বুঝতে হবে। humanity আর humanism এক জিনিস না। humanity মানে হলো মানবতা/মনুষ্যত্ব আর humanism হলো 'মানববাদ' (সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই)।

Scanned by CamScanner

পশ্চিমা দর্শনে—

'ব্যক্তি'র (human person) প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—স্বাধীনতা। প্রাণীসত্তাকে অতিক্রম করে ব্যক্তিসত্তায় যাওয়ার রাস্তা হলো—'পরিপূর্ণ স্বাধীনতা'।[১]

একজন লোক 'ব্যক্তি' হতে পারবে তখন, যখন সে নিজের স্বাধীন সিদ্ধান্ত চর্চা করবে। স্বাধীনভাবে নিজের জীবন গড়ে নেবে এবং জীবন কীভাবে চালাবে—সে নির্দেশনা নিজেই স্বাধীনভাবে দেবে।[২]

আর স্বাধীনতা হলো—

সে-ই স্বাধীন 'ব্যক্তি', যে নৈতিকতার স্রষ্টা, নিজের নৈতিকতা নিজেই ঠিক করে (creator of values)।

স্বাধীন ব্যক্তি পূর্বনির্ধারিত কোনো মূল্যবোধকে মেনে নেয় না। সে মূল্যবোধ-নৈতিকতা নিজে ঠিক করে। Values are not recognized by you, values are determined by you. [৩]

তাদের পরিভাষায় 'স্বাধীনতা' হলো মাপকাঠির স্বাধীনতা—আমার যেটা ভালো মনে হবে, সেটা ভালো। আমার জন্য আমার কাছে যেটা ঠিক মনে হবে, সেটাই ঠিক।

পশ্চিমা সংজ্ঞায় আপনি তখনই 'human', যখন আপনি ভালোমন্দের স্ট্যান্ডার্ড নিজেই ঠিক করবেন। আগের কোনো মূল্যবোধকে মেনে না নিয়ে। মানে... সোজা বাংলায় ধর্মের বেঁধে দেওয়া মূল্যবোধের মাপকাঠিকে স্বীকৃতি না দিয়ে, নিজেই নিজের নৈতিকতার স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে নেবে প্রকৃত 'human'। ধর্মকে অস্বীকারের এই সংজ্ঞার ওপর পুরো পশ্চিমা চিন্তাধারা গঠিত। একেই হিউম্যানিজম বলে, যার নির্যাসে পরিপুষ্ট হয়েছে সেক্যুলারিজম, লিবারেলিজম, ফেমিনিজম, এথিজম-সহ

---

[১] Jean-Paul Sartre, L'Être et le Néant.

[২] A man becomes an 'individual/person' by exercising his free choice, by freely giving form and direction of his life. – Kierkegaard, father of modern existentialism

[৩] প্রাগুক্ত। দর্শনের সব আলোচনাগুলো এখানে থেকে নেওয়া : The Human Person in Contemporary Philosophy, Frederick C. Copleston; PHILOSOPHY; Vol. 25, No. 92 (Jan., 1950), pp. 3-19

Scanned by CamScanner

সব কটি ধারণা।

এই ছিদ্রটা চিনে নিলেই ইসলাম নিয়ে এত এত প্রশ্ন কোত্থেকে আসে, চট করে ধরে ফেলা যাবে। নাস্তিকদের প্রশ্নে আমরা শাখাগত জবাব দিয়ে দায়মুক্ত হই। ধরে নিই, একজন প্রশ্ন করল, নবিজি এতগুলো বিয়ে করেছেন কেন...(খিস্তিখেউড়)? আপনার ধারণা শুধু এই প্রশ্নের জবাব পেলেই সে মুসলিম হয়ে যাবে! তার কটা প্রশ্নের জবাব দেবেন আপনি? নাকি ওই ছিদ্রপথটা বন্ধ করা দরকার?

একইভাবে পশ্চিম থেকে যে শব্দগুলো আসে, সেগুলো সবই একেকটা দর্শন বহন করে। আধুনিকতা, উদারনীতি, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, নারীমুক্তি, প্রগতি। প্রত্যেকটা কথারই আছে একটা পশ্চিমা সংজ্ঞা, পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি, পশ্চিমা দর্শন। যা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে মেনে নিতে তারা আমাদের বাধ্য করছে। শিক্ষার নামে, কারিকুলামের ভেতর দিয়ে এগুলো আমাদের শেখাচ্ছে। আর জাতিসংঘের নামে আমাদের দেশগুলোতে, আমাদের সংবিধানগুলোতে, আমাদের সরকারগুলোকে বাধ্য করছে সেগুলো প্রয়োগ করতে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এই সেক্যুলার লিবারেল মূল্যবোধকে 'প্রশ্নাতীত' হিসেবে, ধর্মীয় অনুশাসনের মতো 'প্রশ্ন ওঠানো ট্যাবু' হিসেবে মনমগজে গেঁথে দেওয়া হয়েছে ৩ প্রজন্ম ধরে; বিভিন্নভাবে মেনে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এ বছরও মে মাসে শিক্ষাখাতে সংস্কারের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে ৪২৮ কোটি টাকা দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।[১] কিছু বোঝা যায়?

আলহামদুলিল্লাহ এ বিষয়ে অনেক ভাই-ই কলম ধরেছেন। অনলাইনে-অফলাইনে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। প্রাথমিক ধারণা পেতে উস্তায ইফতেখার সিফাত হাফিযাহুল্লাহ রচিত *হিউম্যান বিয়িং : শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব* বইটি দেখা যেতে পারে। আমি কি পশ্চিমা 'হিউম্যান' নাকি আল্লাহর 'আবদ'? 'কোনটা হয়ে আমি কবরে যেতে চাই'—এটা তো সেই অনুভূতি বা আত্মজ্ঞান, যা একজন মুসলিমের বালেগ হওয়ার সাথে সাথে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আর একজন নও-মুসলিমের কালিমা পড়ার আগেই এই উপলব্ধির প্রয়োজন। আল্লাহর দেওয়া নৈতিকতা অস্বীকারকারী 'হিউম্যান' হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই? নাকি আল্লাহর দেওয়া নৈতিকতা মেনে তাঁর দাস হিসেবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে চাই? এবার একটা প্রশ্ন। বলতে হবে, সর্বপ্রথম আল্লাহর দেওয়া স্ট্যান্ডার্ড অস্বীকার

---

[১] দেশের শিক্ষাখাতে ৪২৮ কোটি টাকা দিয়েছে ইইউ, ১৯ মে, ২০২০, দৈনিক ইনকিলাব

Scanned by CamScanner

করে 'পশ্চিমা হিউম্যান' কে হয়েছিল? কে বলেছিল—মানি না আল্লাহর স্ট্যান্ডার্ড, আমার স্ট্যান্ডার্ডে আদম শ্রেষ্ঠ না, আমিই শ্রেষ্ঠ?

Scanned by CamScanner

নারী-স্বাধীনতা নাকি দাসত্ব?

মহিউদ্দিন রুপম

নবি ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন—

> *হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়, ভিন্ন ভিন্ন বহু রব উত্তম, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু এমন কতকগুলো নামের ইবাদাত করছ, যে নামগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ; এগুলোর কোনো প্রমাণ আল্লাহ পাঠাননি। বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করতে, এটাই শাশ্বত দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।*[১]

এই পৃথিবী একবস্তা আইডলে ভরা। প্রত্যেকেই চায়—আমরা যেন তাদের অনুসারী হই, তাদেরকে আপন করে নিই; কিন্তু, যখনই আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকিছুকে আমাদের জীবনের সফলতা-ব্যর্থতা, সুখ-দুঃখ নির্ণয়ের ইখতিয়ার দিয়ে দিই, তখন আমরা তার দাসে পরিণত হই। আমাদের জীবনের মূল্য তাকেই ঘিরে বাড়ে কমে। জীবনের সফলতা-ব্যর্থতা—সবকিছু তার ওপর নির্ভর করে নির্ণয় করা হয়। আমাদের পুরো জীবনটা তার নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এককথায় বললে—সে অধিপতিতে পরিণত হয়, আর আমরা তার দাসে; এবং বন্দি হই তার জেলখানায়।

---

[১] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৩৯-৪০

Scanned by CamScanner

কালের পরিক্রমায় নারীদের মূল্য বিবেচনার ক্ষেত্রেও এই অধিপতিরা বিভিন্ন রূপ ধরে আসে। প্রথমে এরা একটি বুলির প্রচার চালায়। আর সেটা হলো 'স্বাধীনতার বুলি'। তারা দেখায়, সমাজে সবাই বন্দি; তারা বোঝায়, কেবল তারাই স্বাধীন! আর মানুষের বিবেক যখন কোনো কিছুতে বন্দি হয়ে যায়, সে তখন ঠিক-বেঠিক যাচাই করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে; কিন্তু, মানুষ নতুনত্ব পছন্দ করে।

সমাজের তথাকথিত অধিপতিরা সর্বপ্রথম অবলাদের নিয়ে কাজ করে। নতুনত্ব দ্বারা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে থাকে। একপর্যায়ে গিয়ে তারা বিশেষ একটি মানদণ্ড দাঁড় করায় এবং এই মানদণ্ডেই সে যুগে নারীদের সফলতা-ব্যর্থতার বিবেচনা করা শুরু হয়। এসব প্রোপাগান্ডার মধ্যে সবচাইতে বেশি প্রভাব ফেলেছে 'পুরুষ আইডল'! অর্থাৎ সবক্ষেত্রে পুরুষদের সমপর্যায়ে থাকার নীতি। Gender Discrimination বা নারী-পুরুষের শারীরিক এবং মানসিক বৈষম্যকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা এবং এই বৈষম্য থেকে বেরিয়ে আসার জন্য জাতিকে যুদ্ধে নামানোর মতো প্রোপাগান্ডা এভাবেই সয়লাব করেছে সমগ্র পৃথিবীজুড়ে। এ দ্বারা নারীকে বোঝানো হয়, তোমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে; এবং পুরুষকে বোঝানো হয়, নারীদের রিস্পেক্ট করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, ব্যাপারটা কি তা-ই?

যেহেতু পাশ্চাত্যের নারীবাদীরা জাতির মস্তিষ্ক থেকে আল্লাহর অস্তিত্বই মুছে দিতে চায়; আর তাই পুরুষ ছাড়া তাদের কাছে ভিন্ন কোনো মানদণ্ড থাকে না। ফলে তারা বাধ্য হয় পুরুষদের মাঝেই নিজেদের মূল্য খুঁজে নিতে। এভাবে একজন নারী এমন কিছুকে তার আইডল বানিয়ে নেয়, এমন কিছুর দাসত্ব শুরু করে, যা কিনা নিজেই ত্রুটিপূর্ণ। তারা ভাবতে শুরু করে—জীবনের মূল্য নির্ধারণে পুরুষই হচ্ছে উপযুক্ত মানদণ্ড; এটাই তাকে স্বাধীন করতে পারে। তারা বিশ্বাস করে—একজন মেয়েশিশু ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মতো মানুষ হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে পুরুষদের মতো সব করতে পারছে। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীন নয়, যতক্ষণ পুরুষদের মতো সব পাচ্ছে কিংবা তার চাইতেও বেশি পাচ্ছে। কারণ—এটাই মানদণ্ড।

পুরুষরা যদি জিন্স প্যান্ট পরতে পারে, তাহলে তাদেরও তা পরতে হবে। পুরুষরা যদি আর্মিতে যেতে পারে, তাদেরও আর্মিতে যেতে হবে। তারা এগুলো চায়; কারণ—মানদণ্ড! স্ট্যান্ডার্ড। নারীরা এটা বুঝতে পারে না, আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষ উভয়কেই স্বতন্ত্রভাবে সম্মানিত করেছেন। স্বতন্ত্র্যের মাঝেই তাদের সম্মান রেখেছেন; একে অন্যের কার্বন কপি হওয়ার মাঝে নয়।

Scanned by CamScanner

একজন নারী যখন পুরুষকে তার স্ট্যান্ডার্ড বানায়, তখন থেকেই অন্তরে একটি সন্দেহ জেঁকে বসে—'আমাকে ঠকানো হচ্ছে।' সে সবকিছুতে সন্দেহ করতে থাকে। এমনকি নিজের অস্তিত্ব নিয়েও কখনো কখনো হীনমন্যতায় ভোগে। যে স্বতন্ত্র গুণ নিয়ে সে জন্মেছে, এগুলো তার নিকট অপমানজনক বলে মনে হয়। আচরণে স্পর্শকাতরতা অপমানজনক, পড়াশোনা শেষে ফুল টাইম মা হওয়া লজ্জাজনক, ভালো রেজাল্ট করে ঘরে বসে থাকা অধঃপতন, বিয়ের পর কেবল ঘরে স্ত্রীর ভূমিকায় থাকা বন্দিত্ব...! এভাবে একজন নারী যখন মনে করে পুরুষের যা আছে, তারা যা করতে পারে, তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে—এগুলোই সর্বোত্তম, তখন তার অন্তরে এই নতুন লক্ষ্য গেড়ে বসে; সমপর্যায়ে থাকার লক্ষ্য।

নারী তখন দাবি করে, একজন পুরুষ যদি এগুলো পেতে পারে, তাহলে আমারও এটা চাই। যদি পুরুষরা ওড়না ছাড়া চলতে পারে, তাহলে আমাকেও সেভাবে চলতে দিতে হবে। পুরুষরা ডিভোর্স দিতে পারে, তাহলে আমাকেও এ অধিকার দিতে হবে। যদি পুরুষরা ঘরের বাইরে কাজ করতে পারে, তাহলে আমিও করতে চাই। যদি পুরুষরা আকাশে প্লেন চালাতে পারে, তাহলে আমিও চালাতে চাই। যদি পুরুষরা পাবলিক স্পিকার হতে পারে, তাহলে আমাকেও হতে হবে। যদি পুরুষরা অন্য দেশে ডিগ্রির জন্য যেতে পারে, তাহলে আমাকেও যেতে হবে। যদি পুরুষরা প্রেসিডেন্ট হতে পারে, তাহলে আমাকেও হতে হবে...ইত্যাদি। পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে। কারণ, পুরুষই স্ট্যান্ডার্ড! সে এসব করে আর ভাবে, সে স্বাধীন! কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সে বন্দি...

আমি এই লেখার মাধ্যমে নারীদের ছোট করার চেষ্টা করছি না মোটেও। বরং, এসব যে একটা নষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার ফল—সেটাই বোঝাচ্ছি। ছোটবেলা থেকেই মেয়ে শিশুদের মনে এই বীজ বুনে দেওয়া হয়। পরিবেশ-পরিস্থিতি তাকে এমন করেই ভাবতে শেখায়। সে হারিয়ে ফেলে স্বাধীনতার মূল চাবি। কোথায় একজন নারীর প্রকৃত সম্মান, তা সে উপলব্ধি করতে পারে না। জীবনের সফলতা-ব্যর্থতা নির্ণয়ে কী হবে তার মানদণ্ড—এ নিয়ে সে থাকে দ্বিধায়। সত্যি বলতে, মেয়েরা এসব নিয়ে ভাবারও সুযোগ পায় না। যে বয়সে মানুষ স্বাধীনভাবে ভাবতে শেখে, সে বয়সে পৌঁছানোর আগেই তাকে এ ধরনের চিন্তা-চেতনায় অভ্যস্ত করে ফেলা হয় এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে সমাজে প্রচলিত এসব রীতিকেই সে মেনে নেয়। মনের অজান্তেই এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে নারী হেরে যায়।

Scanned by CamScanner

অপরদিকে, এই রোগ এতটাই মহামারি আকার ধারণ করেছে যে, দ্বীনে ফিরে আসার পরেও অনেক বোনের মাঝে এর প্রভাব থেকে যায় এবং এটা তাদেরকে একটা পর্যায়ে মডার্নিজমের ভ্রান্তির জালে আটকে দেয়। হিজাব পরে ছেলে ক্লাসমেইটদের সাথে চিল করা, তাদের সাথে আড্ডা দেওয়া, ছেলে বন্ধু রাখা কিংবা বয়ফ্রেন্ড থাকা, পুরুষদের সাথে জব করা, হিজাব পরে ফ্যাশন শো করা এবং এসবকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখা—ইত্যাদি যে কমন দৃশ্যগুলো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বীনি সমাজে, এসবের উৎপত্তি ওই রোগ থেকেই। এবং এটা তাদেরকে ধীরে ধীরে মডার্নিজমের দিকে নিয়ে যায়। তাদেরকে ভাবতে শেখায়, ইসলাম নারীদের পূর্ণ অধিকার দেয় না, কাঠমোল্লারা তাদেরকে একঘরে করে রাখে। মুফতিদের কাছে প্রশ্ন আসে—'ইসলামে নারীর অধিকার নিয়ে আমি কনফিউজড।'

তাহলে সমাধান কোথায়?

সাহাবিগণ যখন নতুন কোনো শহরে প্রবেশ করতেন, সর্বপ্রথম একটি দাওয়াতই নিয়ে যেতেন, 'আমরা এসেছি তোমাদেরকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে নিতে।'[১]

আমরা যদি গভীরভাবে একটু চিন্তা করি তাহলেই উপলব্ধি করতে পারব, এই বক্তব্যের ভেতরে লুকিয়ে আছে অনেক দামি একটি চাবি; প্রকৃত স্বাধীনতার চাবি, যে চাবি দিয়ে ব্যক্তি পাবে সকল দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া বিধানকে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে গ্রহণ করার মাঝে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি মিলবে। মানুষের অন্তরে একমাত্র আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ হওয়ার সদিচ্ছা জাগবে। যখন আমরা আল্লাহর বিধানকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করব, সর্বত্র তাঁর রাসুলের এবং রাসুলের সাহাবিদের নীতি প্রয়োগ করব, তখন সমাজ থেকে যেমন জুলুম বিলুপ্ত হবে, তেমনি সকলের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি লিঙ্গ নয়, বরং তাকওয়া। তিনি বলেন—

> *নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। অবশ্যই তিনি সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।*[২]

---

[১] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবনু কাসির, খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ৪৬

[২] সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩

Scanned by CamScanner

এটাই আল্লাহর মানদণ্ড প্রিয় বোন, লিঙ্গ নয়। তোমার শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষ হওয়ার মাঝে নয়। তোমার মূল্য এত ঠুনকো কিছু দিয়ে নির্ধারণের অধিকার কেউ রাখে না। তোমার দেহের মূল্য কাগজের টাকা নির্ধারণ করতে পারে না। আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য। তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়ার জন্য। তাঁর রঙে রঙিন হওয়ার জন্য। তুমি কি জানো? এই জাঁকজমকপূর্ণ দুনিয়া মূলত এক বিশাল বন্দিশালা। এই দুনিয়ার কাছে তুমি স্বাধীনতা আশা করলেও কখনোই তা পাবে না। সে তোমাকে সর্বদা ঠকাবে। পদে পদে ধোঁকা দেবে। ন্যায়বিচার তার কাছে পাবে না। সে তোমার সরলতার সুযোগ নিয়ে তোমাকে বন্দি করবে। মুক্ত আকাশের কথা বলে তার বানানো অন্ধকার প্রাচীরে ঘিরে ফেলবে। তোমাকে তার প্রোডাক্ট বানাবে। তোমার মস্তিষ্ককে তার কব্জায় নিয়ে নেবে। অপরদিকে, আল্লাহ তোমার জন্য খুলে রেখেছেন স্বাধীনতার দুয়ার, তাঁর তৈরিকৃত জান্নাত তোমার হাতের নাগালে এনে দিয়েছেন। কতই না সহজ উপায় রেখেছেন তিনি!

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যদি কোনো নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রামাদান মাসে সিয়াম পালন করে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, সে যেকোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছেমতো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।'[১]

তাই ফিরে এসো সেই পথে, যে পথে হেঁটে গেছেন নবিগণ। হেঁটেছেন উম্মুল-মুমিনিন রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না। তারা রেখে গেছেন অবদান, নারীজাতিকে করেছেন মর্যাদাবান এবং হয়েছেন সর্বকালের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাদের দেখানো পথে ফিরে এসো, হে বোন!

[১] *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৪১৬৩

Scanned by CamScanner

একটি প্রশ্ন, একটি উত্তর

উস্তায মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান

প্রশ্ন :

কারো কাছে ইসলামের ভুল মেসেজ যাওয়ার কারণে যদি সে ইসলাম গ্রহণ না করে বা ভুলটাই গ্রহণ করে এবং সে অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে—তবে তার ব্যাপারে বিধান কী?

উত্তর :

বর্তমান সময়ে এমন ঘটনা ঘটা বিরল একটি ব্যাপার। হয়তো পৃথিবীতে এমন একটি বা দুটি ঘটনা ঘটতে পারে। এর বেশি সম্ভব বলে আমার (লেখকের) মনে হয় না। কেননা, আজ আমাদের কাছে জ্ঞানার্জন কিংবা বিশ্বের বিভিন্ন তথ্য জানার এত এত মাধ্যম এসেছে যে, ইসলামের নাম শোনেনি কিংবা ইসলামের বার্তা পায়নি—এমন মানুষ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আর যদি ইসলামের ব্যাপারে ভুল কিছুও শুনে থাকে, তবুও একটু চেষ্টা করলে ইসলামের সঠিক বার্তা সন্ধান করে নেওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

Scanned by CamScanner

এরপরেও যদি এমন কেউ থাকে যার কাছে—

» ইসলামের সঠিক দাওয়াত পৌঁছায়নি

» কিংবা তার জন্য ইসলামের সঠিক দাওয়াত জানা সম্ভব ছিল না

» হয়তো দাওয়াত একেবারেই পৌঁছেনি

» অথবা পৌঁছেছিল তবে তা ইসলামের নামে বিকৃত দাওয়াত।

তবে তাদের বিধানের ব্যাপারে ইসলাম ওয়েবে এক প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে—

'...অতঃপর যারা ইসলামকে জানতে ও অনুসন্ধান করতে অক্ষম, তাদের বিধান সে ব্যক্তিদের মতো যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি।

যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত বিকৃতভাবে পৌঁছেছে, এবং যাদের পক্ষে সঠিক দাওয়াত জানা সম্ভব ছিল না, তারা পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের মতো মাজুর বা অক্ষম হিসেবে বিবেচিত হবে।

তবে তাদের পক্ষে যদি সঠিক ইসলাম তালাশ করা ও জানা সম্ভব হয়, কিন্তু তারা তা জানার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করে, তখন তারা আর মাজুর বা অক্ষম বলে বিবেচিত হবে না।'[১]

শাইখ আতিয়া সাকর হাফিযাহুল্লাহ এই ব্যাপারে লেখেন—

وَعَلَى هَذَا نَقُوْلُ أَنَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ أَصْلًا أَوْ بَلَغَتْهُ مُشَوَّهَةً أَوْ... ... ... فَهُوَ مَعْذُوْرٌ

---

[১] ফাতাওয়া নং : 640013; https : //is.gd/h5Jz1b

Scanned by CamScanner

অর্থ : এই কথার ভিত্তিতে আমরা বলি, যার কাছে ইসলামের দাওয়াত একেবারেই পৌঁছেনি কিংবা বিকৃতভাবে পৌঁছেছে অথবা... তবে সে মাজুর বা অক্ষম হিসেবে বিবেচিত হবে।[১][২]

---

[১] *মাওসুয়াতু আহসানিল কালাম ফিল ফাতাওয়া ও আহকাম,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ১৩৯

[২] যারা ইসলামের দাওয়াত পায়নি কিংবা পেলেও সঠিকভাবে সঠিক সময়ে তাদের কাছে তা পৌঁছেনি, তাদের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলিমের মত হলো, তাদেরকে কিয়ামতের দিন আনুগত্যের পরীক্ষা নেওয়া হবে। তারা যদি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর ব্যর্থ হলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

প্রমাণযোগ্য হাদিসেও এর স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—কিয়ামতের দিন চার ধরনের ব্যক্তিকে আনা হবে। **এক.** বধির, যেকোনো কিছু শুনতে পায় না। **দুই.** নির্বোধ। **তিন.** বয়োবৃদ্ধ। **চার.** রাসুলদের অন্তর্বর্তীকালীন যে মারা গেছে। সুতরাং বধির বলবে, হে আমার রব, ইসলাম তো এসেছিল, কিন্তু আমি কিছু শুনতে পাইনি। নির্বোধ বলবে, ইসলাম তো এসেছিল, কিন্তু শিশুরা আমাকে লাদ নিক্ষেপ করত (অর্থাৎ আমি পাগলের মতো ছিলাম, যার কারণে আমি ইসলাম বুঝতে পারিনি)। বয়োবৃদ্ধ বলবে, ইসলাম তো এসেছিল, কিন্তু (হিতাহিত জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক লোপ পাওয়ায়) আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। আর যে ব্যক্তি রাসুলদের অন্তর্বর্তীকালীন মারা গেছে, সে বলবে, আমার কাছে আপনার কোনো রাসুল আসেননি। অতঃপর তিনি তাদের থেকে এ মর্মে প্রতিজ্ঞা নেবেন, তারা অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করবে। সুতরাং তিনি তাদের আদেশ দেবেন যে, তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ওই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, (আল্লাহর প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁর আদেশ পালনার্থে) যদি তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত, তাহলে (তারা সত্যবাদী হওয়ায় আল্লাহর রহমতে) তাদের জন্য তা শীতল ও আরামদায়ক হয়ে যেত।—*মুসনাদু আহমাদ* : ১৬৩০১

এরপরের বর্ণনায় এভাবে এসেছে—সুতরাং আদেশপ্রদানের পর যে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে, জাহান্নাম তার জন্য শীতল ও আরামদায়ক হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে না তাকে জাহান্নামে টেনে আনা হবে।—*মুসনাদু আহমাদ* : ১৬৩০২

'শীতল ও আরামদায়ক' কথাটি দু-ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—**এক.** তাদের জন্য তা কষ্টকর না হয়ে তাৎক্ষণিক জান্নাতের মতো শীতল ও আরামদায়ক হয়ে যাবে, এরপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। **দুই.** তাদের জাহান্নামে না দিয়ে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

Scanned by CamScanner

আলেকজান্দ্রিয়ার বইগুলো কে পুড়িয়েছেন?

আরিফুল ইসলাম

ভার্সিটির সেন্ট্রাল লাইব্রেরির নাম পরিবর্তন করে 'বিসিএস লাইব্রেরি' করলেই হয়। ভোরবেলা থেকে শিক্ষার্থীরা লাইন ধরে থাকে লাইব্রেরিতে বসার একটা সিট পাবার জন্য। বসে কী পড়বে? ব্যাগে করে নিয়ে আসা বিসিএসের বই!

শুনেছিলাম এই লাইব্রেরিতে নাকি প্রায় ছয় লক্ষ বই আছে। তবে দুঃখজনক বিষয় হলো, কোনো প্রয়োজনে লাইব্রেরিতে বই খুঁজতে গেলে দেখা যায় বইয়ের গায়ে ধুলোবালির স্তূপ জমে আছে। বই পড়তে গেলে আগে বইয়ের ধুলোবালি মুছে নিতে হয়।

ভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর শিক্ষার্থীদের বিসিএসের চিন্তা এমনভাবে পেয়ে বসে যে, লাইব্রেরির অন্যান্য বই খুলে দেখার সময়ও তারা পায় না। অবশ্য এর মধ্যে ব্যতিক্রমও কেউ কেউ আছে। আরজু তাদের একজন।

আজ আরজু লাইব্রেরিতে আসেনি, আমি একা এসেছি। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী নিয়ে আমরা একটি কাজ শুরু করেছি। আমরা বলতে—আমি, জামান এবং আরজু। ইসলামের ইতিহাস নিয়ে অমুসলিম ওরিয়েন্টালিস্ট লেখকদের বই থেকে শুধু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর অংশটুকু আলাদা করার কাজ আমার। জামানের কাজ ইসলামি ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলো থেকে শুধু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর অংশগুলো আলাদা করা। আর আরজুর কাজ হলো উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে

Scanned by CamScanner

করা অমুসলিম, ওরিয়েন্টালিস্টদের বিভিন্ন অভিযোগ এবং তার জবাব দেওয়া।

লাইব্রেরিতে আমার কাজ শেষ করে মোবাইল বের করলাম। আরজু বেশ কয়েকবার ফোন করেছে। লাইব্রেরিতে ঢোকার সময় মোবাইল সাইলেন্ট করেছিলাম; তাই বুঝতে পারিনি।

আরজুকে ফোন করলাম। সে কাজী নজরুল ইসলামের কবরের পাশে বসে আছে। দুপুরে আমাদের একসঙ্গে খেতে যাবার কথা। অনেকদিন ধরে পুরান ঢাকার বিরিয়ানি খাই না।

ব্যাগ গুছিয়ে আরজুর কাছে গেলাম। আরজু আলি সাল্লাবির লেখা *উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী* বইটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। আরজুর পাশে বসলাম। কবরের দিকে তাকিয়ে আরজু বলল, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে লেখা কাজী নজরুল ইসলামের 'উমর ফারুক' কবিতা পুরোটা পড়েছিস?

'মাধ্যমিকের বাংলা বইয়ে যেটা ছিল?'

'হ্যাঁ, অবশ্য বইতে সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া ছিল। পুরো কবিতাটা আরও বড়।'

'না, পুরোটা পড়িনি।'

আরজু মোবাইল বের করে 'কবিতাগুচ্ছ' অ্যাপটা ওপেন করল। এটাতে আরজু তার পছন্দের কবিতাগুলো নোট করে রাখে।

যুহরের সালাতের বেশ বাকি আছে। আরজু কবিতা আবৃত্তি শুরু করল। কী দরদমাখা ভাষায় কাজী নজরুল ইসলাম উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনচিত্র কবিতায় তুলে ধরছেন—

ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।

কবিতা আবৃত্তির এই পর্যায়ে এসে উপস্থিত হলেন রিয়ান ভাই, সাথে তার স্কোয়াড। আদর্শিক দিক থেকে আরজু আর রিয়ান ভাই উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু হলেও তাদের মধ্যে বেশ সখ্য। আরজু যেমন তার আদর্শিক দাওয়াতের বই রিয়ান ভাইকে উপহার দেয়, রিয়ান ভাইও তাদের আদর্শিক বইগুলো আরজুকে উপহার দেন।

Scanned by CamScanner

'শাহবাগ যাচ্ছিলাম। দেখলাম তুমি এখানে বসে আছ, তাই ভাবলাম ছোট ভাইটার সাথে দেখা করে যাই।'

'যাক, ছোট ভাইয়ের কথা মনে আছে তাহলে!'

রিয়ান ভাই নানা ব্যস্ততার কথা বললেন, যার দরুন আমাদের সাথে দেখা করতে পারছেন না ইদানীং। তার সাথে থাকা সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আরজুর চোখ গেল একজনের হাতে থাকা একটি বইয়ের দিকে। ছেলেটির নাম রণক, Sociology-তে পড়ে। রণক বইটি উঁচিয়ে দেখাল, মুহম্মদ জাফর ইকবালের লেখা *আরো একটুখানি বিজ্ঞান*।

রণক বলল, 'রিয়ান ভাই বইটা গিফট করেছেন।'

'না বললেও বুঝতাম, এই বইটা রিয়ান ভাই-ই গিফট করে থাকবেন। কয়েকদিন আগে আমাকেও তিনি বইটা গিফট দিয়েছিলেন। বইটা এখনও পড়া হয়নি।'

আমরা এখন কী কাজ করছি জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী নিয়ে কাজ করছি।'

রিয়ান ভাই বললেন, 'Oh! The man who burnt the books in Alexandria Library?'

আরজু বলল, 'রিয়ান ভাই, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম শোনার পর তো একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফার কথা বলতে পারতেন, বলতে পারতেন একজন প্রজাদরদি খলিফার কথা; কিন্তু তা না বলে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি পোড়ানোর কথা কেন বলছেন?'

'আসলে আরজু, এটা মানবপ্রকৃতি। যেমন ধরো, একটা হোয়াইট বোর্ডে যদি কালো মার্কারের একটা দাগ থাকে তাহলে পুরো হোয়াইট বোর্ডে সাদা অংশটুকুতে চোখ না পড়ে শুধু চোখ আটকাবে কালো অংশটুকুতে। ঠিক তেমনই, উমার অনেক কিছু করছেন ঠিক; কিন্তু তার জীবনের ওই একটা কাজ পুরো হোয়াইট বোর্ডের কালো দাগের মতো ভেসে ওঠে।'

Scanned by CamScanner

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের হোয়াইট বোর্ডে কালো দাগটা কী সেটা রিয়ান ভাই এক্সপ্লেইন করলেন। তিনি যা বললেন, তা মোটামুটি এরকম—

খলিফা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময় যখন মিশর বিজিত হয় তখন মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করা হয় আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির বইগুলো কী করবেন, সে-সম্পর্কে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন—

'বইপত্রগুলো যদি কুরআনের শিক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ না হয়, তবে সেগুলো আমাদের দৃষ্টিতে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। কাজেই এগুলোর ধ্বংস অনিবার্য। আর বইপত্রগুলোতে যদি কুরআনের শিক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ কথা থেকেও থাকে, তবে সেগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাই বইগুলো ধ্বংস করো।'

খলিফার নির্দেশে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেলেন। তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম লাইব্রেরিটি এভাবেই ধ্বংস করা হয়। ধর্মীয় কুসংস্কারের নির্মম বলি হয় দ্য গ্রান্ড লাইব্রেরি।

ঠিক এই বিষয়টি নিয়ে গতরাতে আরজুর সাথে আলোচনা হয়েছে। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী লেখার কাজটুকু করতে গিয়ে আরজুর পার্টে এটা পড়েছিল। এই বিষয়ে আমার পার্ট থেকে কিছু ইনফরমেশন আরজুকে দিয়েছিলাম। যেহেতু আমার কাজ ছিল অমুসলিম লেখকদের বই থেকে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর অংশটুকু আলাদা করা।

গতরাতের তথ্যগুলো থেকে আরজু বলা শুরু করল—

'রিয়ান ভাই, মুসলিমরা মিশর জয় করে ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে আর আপনি যে ঘটনাটি বললেন, সেটি লিপিবদ্ধ করা হয় মিশর জয়ের প্রায় ৬০০ বছর পরে।'

রিয়ান ভাই এবার একটু নড়েচড়ে বসলেন।

'প্রথমে আব্দুল লতিফ (১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ) তারপর ইবন আল কিফতি (১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ) এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। এই দুজনের উদ্ধৃতি দিয়ে খ্রিষ্টান লেখক বারহেব্রাইয়াস (Barhebraeus) ঘটনাটি উল্লেখ করেন। ১৬৬৩ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির আরবি বিভাগের প্রফেসর Edward Pococke এই ঘটনাটি উল্লেখ

Scanned by CamScanner

করে পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় করে তোলেন।'

এই বলে আরজু তার হাতে থাকা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী নিয়ে লেখা ড. মুহাম্মদ আলি আস-সাল্লাবির বইটি খুলল।

'এই দেখুন রিয়ান ভাই, ড. মুহাম্মাদ আলি আস-সাল্লাবি তার *Umar Ibn Al-Khattab- His Life and Times* গ্রন্থে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়া নির্দেশের ঘটনাটিকে একটি 'বানোয়াট গল্প' বলে উল্লেখ করেছেন।'[১]

আরজুর কথা শুনে রিয়ান ভাই বিকৃত এক হাসি দিলেন। তার সাথের একজনকে বললেন, ব্যাগ থেকে বই বের করতে। সে ব্যাগ থেকে বই বের করলে রিয়ান ভাই বললেন, এই দেখো, এম.এন রায় তার *The Historical Role of Islam* বইতেও এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। একজন মুসলিম ইতিহাসবিদ উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডিফেন্ড করতে এই ঘটনাকে 'বানোয়াট' বলতেই পারে; কিন্তু এম.এন. রায় ঠিকই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। এবার বলো, কার কথাকে সঠিক মানব?

আমার ব্যাগ খুঁজতে লাগলাম। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই ঘটনাকে অমুসলিম ইতিহাসবিদরা কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন এটার এক কপি আরজুকে দিয়েছিলাম, আরেক কপি আমার ব্যাগে থাকার কথা। আলহামদুলিল্লাহ, খুঁজে পেলাম। আরজুর কাছে কপিটা দিয়ে বললাম, এই নে।

আরজু কৃতজ্ঞতার হাসি দিয়ে কপিটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলা শুরু করল—

'আপনি এই ঘটনার জন্য যেহেতু মুসলিম সোর্সগুলোর ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না, এজন্য আমি অমুসলিম সোর্সগুলো থেকেও ঘটনাটি প্রমাণ করার চেষ্টা করব, ইনশা আল্লাহ। ইসলামের ইতিহাস জানতে আপনারা যে ব্যক্তিটির ওপর ভরসা করেন, সেই পি.কে. হিট্টি এই ঘটনাটিকে কী বলেছেন—এবার দেখে নেওয়া যাক। আরজু হাতে থাকা কপি থেকে পড়া শুরু করল।

পি.কে. হিট্টির ভাষায়—

---

[১] *Umar Ibn al-Khattab – His Life & Times*, Dr. Muhammad Ali al-Sallabi, vol-2, page 339-341

Scanned by CamScanner

> At the time of the Arab conquer (Egypt), therefore no library existed in Alexandria.

অর্থাৎ, আরবরা যখন মিশর জয় করে তখন আলেকজান্দ্রিয়ায় কোনো লাইব্রেরিই ছিল না।

মুসলিমরা মিশর জয়ের আগে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি অন্তত ৪ বার বিভিন্ন যুদ্ধের সময় পুড়িয়ে ফেলা হয়। প্রথমবার ৮৯-৮৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, দ্বিতীয়বার জুলিয়াস সিজার কর্তৃক ৪৮ খ্রিষ্টাব্দে, তৃতীয়বার ২৭৩ খ্রিষ্টাব্দে, চতুর্থবার ৩৯১ খ্রিষ্টাব্দে।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশের ইতিহাসকে পি.কে হিট্টি বলেন—

> Tales that make good fiction but bad history.

অর্থাৎ, এই গল্পটা 'বানানো গল্প' হিসেবে খুব ভালো; কিন্তু ইতিহাসের বেলায় খুবই দুর্বল।[১]

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আর্থার স্ট্যানলি ট্রিটন তার *What Happened To The Ancient Library Of Alexandria* গ্রন্থে লেখেন—

> It has been proved that Umar I did not destroy the library at Alexandria.

আরেকটু অগ্রসর হয়ে তিনি লেখেন—

> The myth of the Arab destruction of the library of Alexandria is not supported by even a fabricated document.

অর্থাৎ, আরবদের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ধ্বংসের কাহিনি কোনো জাল দলিল দিয়েও সমর্থিত নয়।[২]

---

[1] *History Of The Arabs From The Earliest Times To The Present* by Philip K. Hitti, page 166

[2] *What Happened To The Ancient Library Of Alexandria* by Bernard Lewis, page 213 – 217

Scanned by CamScanner

এতটুকু শুনেই রিয়ান ভাই আর তার স্কোয়াডের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম, এর পরের তথ্যবোমা শুনে না জানি কী অবস্থা হয়।

আরজু বলে চলল, 'আপনারা যাকে দার্শনিক পিতা বলেন, হুমায়ুন আজাদ তার *আমার অবিশ্বাস* বইটি যাকে উৎসর্গ করেছিলেন, সেই ব্রিটিশ দার্শনিক এবং ইতিহাসবিদ বার্ট্রান্ড রাসেল তার *Human Society in Ethics and Politics* গ্রন্থে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেবার কাহিনিকে মুসলিমদের অসহিষ্ণুতা প্রমাণের জন্য 'খ্রিষ্টানদের প্রোপাগান্ডা' এবং 'সম্পূর্ণ বানোয়াট' বলে অভিহিত করেছেন।'[১]

কিছু মানুষ তাদের পছন্দের মানুষদের কথা শুনলে বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়। তাদের এসব পছন্দের মানুষরা যা-ই বলুক না কেন, কথায় কথায় তারা বলে 'সহমত ভাই'।

রিয়ান ভাইদের কাছে বার্ট্রান্ড রাসেল এমন একজন ফিগার। বার্ট্রান্ড রাসেল যেহেতু ঘটনাকে বানোয়াট বলেছেন, রিয়ান ভাইদেরও তখন আর মেনে নিতে আপত্তি নেই, ঘটনাটি যে বানোয়াট।

রিয়ান ভাই তখন হয়তো মনে মনে বলছেন, 'ছেড়ে দে ভাই, কেঁদে বাঁচি'; কিন্তু আরজু ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, বলেই চলল,

'আরেক ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আলফ্রেড জে. বাটলার উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর লাইব্রেরি পোড়ানোর নির্দেশ দেওয়ার ইতিহাসকে একটি হাস্যকর কাহিনি বলে উল্লেখ করে বলেছেন—

> The story is a mere fable, totally destitute of historical foundation.[২]

ভারতের পণ্ডিত ডি.পি. সিংহাল তার *India and World Civilization* গ্রন্থে কাহিনিটিকে একটি 'বানোয়াট' কাহিনি বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

---

[1] *Human Society In Ethics And Politics by Bertrand Russell*, page 217 – 218

[2] *The Arab Conquest Of Egypt And The Last Thirty Years Of The Roman Dominion* by Alfred J. Butler, page 405 – 408

[৩] *India And World Civilization* by D. P. Singhal, volume 1, page 136 – 137

Scanned by CamScanner

এডওয়ার্ড গিবন এই কাহিনিকে জোরালোভাবে অস্বীকার করে বলেন—

> I am strongly tempted to deny both the fact and the consequences.' [১]

এই বলে আরজু উঠে দাঁড়াল। রণকের হাত থেকে *আরো একটুখানি বিজ্ঞান* বইটি নিয়ে রিয়ান ভাইকে দিয়ে বলল, 'অন্তত এই বইটার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা উল্টালেই আপনার অভিযোগের জবাব পেয়ে যাবেন।'

এই বলে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। পেছনে চেয়ে দেখলাম রণক ভাই *আরো একটুখানি বিজ্ঞান* বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে।

মনে মনে বললাম, এখনও কি তাদের সত্য গ্রহণের সময় আসেনি?

---

[১] *The History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire* by Edward Gibbon, volume V (3), page 439

Scanned by CamScanner

কুরআনে এত পুনরুক্তি কেন?

নাফিস শাহরিয়ার

আল্লাহ তাআলা কুরআনে যে বিষয়গুলো একবারের বেশি উল্লেখ করেছেন, সেই বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো এমন সব বিষয় যা আমরা সহজে বুঝতে পারি না। সহজে উপলব্ধি করতে পারি না। দু-একবার সেই-সংক্রান্ত আয়াতগুলো পড়লে আমাদের ভেতরে কোনো বড় পরিবর্তন আসে না। এ কারণেই আয়াতগুলো বারবার পড়ে খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করা দরকার।

কিছু ব্যাপার রয়েছে যেগুলো মানুষকে একবার, দু-বার বললে তারা এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে না। এই বিষয়গুলো মানুষকে বহুবার বলতে হয়। যেমন—পুরো কুরআনে সিয়াম পালনের নির্দেশ এসেছে মাত্র একবার; কিন্তু সালাত আদায় করার নির্দেশ এসেছে ৮১ বার। অথচ রামাদান মাসে ঠিকই দেখা যায়—যেই বান্দা কোনোদিন সালাতে দাঁড়ায় না, সারাদিন মিউজিকে বুঁদ হয়ে থাকে, প্রতিদিন একটা মুভি বা হিন্দি সিরিয়াল না দেখলে ডিপ্রেশনে চলে যায়—সেই বান্দা রামাদান মাস এলে, এসব বাদ দিয়ে পুরো মাসটি সিয়াম রাখছে। গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদে সারাদিন না খেয়ে, এক ফোঁটা পানিও পান না করে, তার বদভ্যাসগুলো নিয়ন্ত্রণে রেখে, সিয়াম পালন করার মতো কঠিন একটি কাজ সে দিব্যি করে ফেলছে। এর জন্য তাকে কুরআনে ৮১ বার সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিতে হয় না।

অথচ, আল্লাহর এই বান্দাদের সালাতে তেমন দেখা যায় না! দুঃখজনক ব্যাপার হলো, একজন মোটামুটি সিরিয়াস ধরনের মুসলিম, যে কিনা সিগারেট টানে না,

Scanned by CamScanner

প্রতিদিন মিউজিকে বুঁদ হয়ে থাকে না, কখনো হিন্দি সিরিয়াল দেখে না, ফেইসবুকে নিয়মিত ইসলামিক আর্টিকেল লাইক/শেয়ার করে, ইসলাম নিয়ে কেউ খারাপ কিছু বললে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইসলামের মানসম্মান রক্ষা করতে—এই ধরনের মুসলিমদেরও প্রতিদিন গড়ে তিন ওয়াক্ত সালাতও পড়তে দেখা যায় না। কুরআনে ৮১ বার সালাতের নির্দেশ আসার পরেও এদের এই অবস্থা, সেখানে ১ বার বা হাতেগোনা কয়েকবার বললে কী হতো—তা বলাই বাহুল্য। একবার, দুবার, দশবার, এমনকি বিশবার সালাতের কথা বলেও লাভ হয় না। এদেরকে বারবার, দিনের পর দিন স্মরণ করিয়ে দিতে হয়।

আর সামঞ্জস্যের সাথে পুনরাবৃত্তির কী সম্পর্ক? বরং পুনরাবৃত্তি করার পরও যদি কোনো পার্থক্য না থাকে, তাহলে তো সেটা আরও বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের এই দাবিতেই তো দেখি কোনো সামঞ্জস্য নেই!

Scanned by CamScanner

কুরআনের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি কি বর্তমান হতে ভিন্ন?

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

বিদেশি নাস্তিক এবং খ্রিষ্টান ইভানজেলিস্টদেরকে[১] পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণ ও অবিকৃত থাকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে প্রচুর ভিডিও বানাতে দেখা যায়। তাদের দাবি কুরআনের কিছু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি নাকি পাওয়া গেছে—যার কিছু অংশ এখনকার কুরআন থেকে ভিন্ন! প্রাচ্যবিদদের নানারকম বইপত্র পড়ে প্রভাবিত কোনো কোনো পশ্চিমা দাঈ (দ্বীন-প্রচারক) থেকেও কখনো কখনো এ প্রসঙ্গে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য, ইসলামবিরোধীরা এর সদ্ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্রও কসুর করে না। দেশীয় ইসলামবিরোধীদেরকেও এদের মুখের ঝাল খেতে দেখা যায়। ফেইসবুক, ব্লগ-সহ বিভিন্ন মাধ্যমে এ প্রসঙ্গে তাদের নানা অপপ্রচার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

প্রথমেই বলে নিই—বর্তমান প্রচলিত কুরআন থেকে ভিন্ন প্রাচীন কুরআনের পাণ্ডুলিপি পাওয়া খুবই সম্ভব এবং খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। এতে বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই। এতে কুরআনের সংরক্ষণ মোটেই প্রশ্নবিদ্ধ হয় না।

অবাক হচ্ছেন কি?

অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

---

[১] খ্রিষ্টধর্ম প্রচারক যারা যীশুর শিক্ষা ও বাণী পৌঁছে দেয় ও ধর্মান্তরিত করে।

Scanned by CamScanner

কুরআনুল কারিম নাযিল সম্পর্কে বিস্তারিত ইতিহাস জানা থাকলে মুসলিম উম্মাহর কেউই এটা নিয়ে বিচলিত হতো না। পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ তাআলা ৭টি আরবি হারফ (বহুবচনে আহরুফ) বা ধরনে নাযিল করেছেন। শুরুতে কুরআন নাযিল শুরু হয়েছিল ১টি হারফে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মাহর কাছে সহজ করার জন্য এবং ইসলাম প্রচারের সুবিধার্থে আল্লাহ তাআলার কাছে ভিন্ন আরও কিছু হারফে কুরআন নাযিলের দুআ করলে আল্লাহ তাআলা সর্বমোট ৭টি হারফে কুরআন নাযিল করেন। এ প্রসঙ্গে অনেক বিশুদ্ধ বিবরণ রয়েছে।[১] এই ৭টি হারফের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ছিল এমনকি ভিন্ন ভিন্ন বাক্যও ছিল। সে সময়ের প্রাচীন আরবি ভাষায় যবর, যের, পেশ ছিল না, বিভিন্ন হারফের মধ্যে নুকতাও ছিল না। লিখিত কুরআনকে বিভিন্নভাবে পড়ার জন্য বিভিন্ন রকম পঠন-পদ্ধতি ছিল। এগুলোকে বলা হয় কিরাআত। একেকটি উপভাষার কুরআন অনেক রকম কিরাআতে পড়া যেত। এই সকল হারফ (উপভাষা) এবং কিরাআত (পঠন-পদ্ধতি) সাহাবিগণের মাঝে প্রচলিত ছিল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সমগ্র কুরআন একটি সুহুফ আকারে সংকলন করেন। আস্তে আস্তে ইসলামি খিলাফাত তৎকালীন পরিচিত পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকটা অংশে ছড়িয়ে যায়।

---

[১] আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কুরআন ৭ আহরুফে নাযিল হয়েছে। কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা কুফরি।" তিনবার কথাটা বললেন। তারপর যোগ করলেন, 'তোমরা এর মধ্যে যা জানবে, তার ওপর আমল করবে, আর যা জানবে না, তা সম্পর্কে জানতে বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে ফিরে যাবে।'—*সুনানু আবি দাউদ* : ৪৬০৩

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কুরআন ৭ আহরুফে নাযিল হয়েছে। যে হারফে তোমরা পড়বে, সেটাই ঠিক হবে। তাই এটা নিয়ে ঝগড়া করো না। কারণ, কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা কুফরি।' আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কুরআন ৭ আহরুফে নাযিল হয়েছে। যে হারফে তোমরা পড়বে, সেটাই ঠিক হবে। তাই এটা নিয়ে ঝগড়া করো না। কারণ, কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা কুফরি।'—*মুসনাদু আহমাদ* : ১৭৮১৯

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'জিবরিল আলাইহিস সালাম আমাকে ১ হারফে পড়ালেন। পরে আমি তার সাথে বিষয়টি নিয়ে পুনরায় কথা বললাম। আমি তাকে বাড়াতে বলছিলাম আর তিনি বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। অবশেষে ৭ হারফে গিয়ে থামলাম।'—*সহিহুল বুখারি* : ৪১৯৯; *সহিহ মুসলিম* : ৮১৯

Scanned by CamScanner

বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায় কুরআন বিভিন্ন হারফে ও বিভিন্ন কিরাআতে পঠিত হচ্ছে। সকল হারফ ও কিরআতের ব্যাপারে সকলের সম্যক ধারণা ছিল না। ফলে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে দেখা গেল—লোকেরা একে অন্যের সম্পূর্ণ সঠিক তিলাওয়াতকেও ভুল বলে সাব্যস্ত করতে শুরু করল। অনারবরা তো বটেই, এমনকি আরবিভাষীদের মধ্যেও এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি দেখা গেল। কারণ, সবাই তো সব হারফ জানত না। আবার অনেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কুরআন লিপিবদ্ধ করছিল। লেখার সময়ে কুরআনে কিছু জায়গায় ভুল হচ্ছিল, কেউ কেউ এর মধ্যে নোট করে ব্যাখ্যাও লিখছিল। সেগুলোও মূল কুরআনের সাথে মিশ্রিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলো। এহেন পরিস্থিতিতে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু মদিনার সাহাবিগণের সাথে পরামর্শ করলেন। এরপর সবাই ইজমায় উপনীত হলেন। আর তা হলো নিম্নরূপ—

এক. আলিম সাহাবিগণের দ্বারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে সংকলিত সুহুফের সাহায্যে কুরআনের কিছু মুসহাফ[১] তৈরি করা হবে।

দুই. এই মুসহাফগুলো ইসলামি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হবে। সাহাবিগণের সম্মিলিতভাবে প্রস্তুতকৃত সেই মুসহাফ থেকে কপি করে সকলে নির্ভুল মুসহাফ তৈরি করবে।

তিন. শুধু একটি হারফে কুরআনকে সংরক্ষণ করা হবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার কওম ছিল কুরাইশি আরবিভাষী। উম্মতের কাছে কুরআনে কারিমের পাঠদান ও তিলাওয়াত সহজ করার জন্য ইসলামের প্রাচীন যুগে বিভিন্ন হারফের জরুরত ছিল; কিন্তু ইসলাম তৎকালীন পরিচিত পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক অংশে ছড়িয়ে যাওয়ায় মুসলিমদের মধ্যে বিশেষত অনারব মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন হারফ থেকে মতভেদ সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল। কেউ হয়তো বা এক হারফ পাঠ করে অন্য হারফকে ভুল সাব্যস্ত করতে পারত। তাছাড়া, ৭টি হারফের সবগুলো পাঠ করা কখনোই আবশ্যক কিছু ছিল না, বরং সহজ করার জন্য এই অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। এই ৭ হারফ থেকে যেকোনো ১টি হারফ বেছে নেওয়ার এবং অন্য সব হারফ বাদ দেওয়ার অবকাশ ইসলামের শুরু থেকেই ছিল। সহজ করা যেহেতু শরিয়তের উদ্দেশ্য ছিল, সবগুলো হারফ পাঠ করার কোনো বাধ্যবাধকতা যেহেতু দেওয়া হয়নি, এজন্য সাহাবিগণ একটি হারফে কুরআন সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

---

[১] অর্থাৎ একই মলাটের মধ্যে সম্পূর্ণ কিতাব আকারে।

Scanned by CamScanner

চার. ব্যক্তিগত উদ্যোগে কুরআনের যেসব কপি তৈরি করা হয়েছিল, এর সবগুলোকে আলিম সাহাবিগণের দ্বারা যাচাই করা অসম্ভব ছিল। কাজেই এর কোনোটির মধ্যে কোনো জায়গায় ভুল ছিল কি না—তা সূক্ষ্মভাবে যাচাই করা কোনো ক্রমেই সম্ভব ছিল না। এসব কপিতে সামান্যতম ভুলও যদি রয়ে যায়, তবে তা পরবর্তী কালের জন্য ভয়াবহ সমস্যা তৈরি করবে। কাজেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরিকৃত সকল কপি পুড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। তবে, পোড়াবার পূর্বে পৃষ্ঠাগুলো ধুয়ে নেওয়া হয়েছিল।

কুরআন সংরক্ষণের গৃহীত এই ব্যবস্থা সকল সাহাবির ঐকমত্যের ভিত্তিতে ছিল। তবে মদিনা থেকে দূরে অবস্থানরত কোনো কোনো সাহাবি, যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এই ব্যবস্থার সকল দিক সম্পর্কে অবহিত না থাকায়, নেক নিয়তেই প্রথম প্রথম এর বিরোধিতা করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তী সময়ে সব দিক অবহিত হয়ে তারাও এ ব্যাপারে একমত হয়ে যান বলে বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ কুরআন সংকলনের এই ব্যবস্থা সকল সাহাবির ইজমার ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ বিষয়ে স্বয়ং আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিবৃতি রয়েছে, 'আল্লাহর শপথ, তিনি এই খণ্ডাংশগুলো নিয়ে আমাদের উপস্থিতিতেই যা করার করেছেন।'

এভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ জীবনে যেভাবে কুরআন নাযিল হয়েছিল, এর ভিত্তিতে কুরআনে কারিমের ১টি হারফকে সাহাবিগণ ইজমায় উপনীত হয়ে সংকলন করেন। ব্যাপক যাচাই করে নির্ভুল অনেকগুলো কপি তৈরি করেন। অতঃপর সে কপিগুলো মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। সেগুলো দিয়ে ইসলামি খিলাফাতের অধীন বিভিন্ন প্রদেশে কুরআনের অজস্র কপি তৈরি করা হয়। আমরা আজ যে কুরআন পড়ি তা সেই উসমানি মুসহাফের কপিগুলোরই উত্তরাধিকার। এই মুসহাফ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আমলে সংকলিত মুসহাফের ১টি হারফ থেকে হুবহু সংকলিত এবং এটাই হুবহু সেই কুরআন যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাহর জন্য রেখে গিয়েছিলেন। এই এক হারফের কুরআনকে বিভিন্ন পঠনপদ্ধতি বা কিরাআতে পড়া যায়। যেমন—হাফস, ওয়ারশ, কালুন ইত্যাদি। এই পঠনপদ্ধতিগুলো সাহাবিগণের আমল থেকেই প্রচলিত ছিল এবং এখনো আছে। বিশ্বের অধিকাংশ জায়গাতে হাফস কিরআতই পড়া হয়। তবে অন্য কিরআতগুলোও স্বল্প আকারে প্রচলিত আছে।

Scanned by CamScanner

কুরআন সংকলনের ইতিহাস এবং এর বিভিন্ন হারফের ব্যাপারে বিশাল আলোচনা অতি সংক্ষেপে উপস্থাপনের চেষ্টা করলাম। আশা করি বিষয়টি সকলের বুঝে এসেছে। বর্তমান সময়ের কুরআন থেকে ভিন্ন টেক্সটযুক্ত প্রাচীন কুরআনের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার হওয়ার পেছনে যে কারণগুলো থাকতে পারে—

এক. হয়তো সেটি আমরা যে হারফের কুরআন পড়ি (অর্থাৎ সাহাবিগণ ইজমায় উপনীত হয়ে যে ১টি হারফে কুরআন সংরক্ষণ করেছিলেন), তা থেকে ভিন্ন কোনো হারফের প্রাচীন কুরআন।

দুই. অথবা সেটি হয়তো প্রাচীনকালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে লিপিবদ্ধ করা কোনো মুসহাফ যাতে লিপিকার কিছু জায়গায় ভুল করেছেন।

কাজেই এই সকল পাণ্ডুলিপি মোটেও কুরআনের সংরক্ষিত থাকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না। কুরআনের বিভিন্ন হারফ (বহুবচনে আহরুফ)-এর কথা সহিহ সনদেই বর্ণিত আছে। আমাদের প্রাচীন আলিমগণ বারংবার এগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেই আলিমগণই কুরআন অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত থাকবার কথা উল্লেখ করেছেন। সমস্যা হলো, বর্তমান যুগে মুসলিম উম্মাহর সিংহভাগ লোকই কুরআন নিয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানচর্চা করে না। ফলে, তারা কুরআন সংকলনের ইতিহাস এবং এর বিভিন্ন উপভাষার ব্যাপারে অজ্ঞ। তারা যখন ইসলামবিরোধীদের থেকে ভিন্ন শব্দ বা বাক্যের প্রাচীন কুরআনের ম্যানুসক্রিপ্টের কথা শোনে তখন বেশ ঘাবড়ে যায়। মূলত এখানে ঘাবড়ানোর কিছুই নেই। ইসলামবিরোধীরা অতি কৌশলে প্রথম দিকে উসমানি মুসহাফের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর আপত্তি-সংক্রান্ত বিবরণগুলো উল্লেখ করে বোঝাতে চায়—সাহাবিগণের মধ্যে বুঝি কুরআন সংকলন নিয়ে ব্যাপক মতবিরোধ (!) ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং পরবর্তীকালে উসমানি মুসহাফের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন ওই বিবরণগুলোকে ইসলামবিরোধীরা বেমালুম চেপে যায়।

এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, এতে কোনো রেফারেন্স উল্লেখ করিনি। আগ্রহীরা রেফারেন্স সহকারে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে নিচের আর্টিকেলগুলো পড়তে পারেন। আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম তার বিভিন্ন তথ্যের রেফারেন্স এই আর্টিকেলগুলোতে পেয়ে যাবেন, ইনশা আল্লাহ।

Scanned by CamScanner

নোট

- *Who wrote the Qur'aan and how was it put together? (IslamQA) [www.islamqa.info/en/10012/]*
- *'Uthmaan's compilation of the Mushaf in one style (harf) (IslamQA) [www.islamqa.info/en/125091]*
- *The revelation of the Qur'aan in seven styles (ahruf, sing. harf) (IslamQA) [www.islamqa.info/en/5142]*
- *The seven modes of recitation are mutawaatir and it is not permissible to cast aspersions on them (IslamQA) [http://www.islamqa.info/en/178120]*
- *Versions Of The Qur'an? - Islamic Awarness [www.islamic-awareness.org/quran/text/qiraat/hafs.html]*
- *The Qur'anic Manuscripts - Islamic Awarness [www.islamic-awareness.org/quran/text/mss/]*
- *'কুরআনের বিভিন্ন কিরাত এবং আহরুফ কি কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন ভার্সন?'—শাইখ আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া (YouTube) [www.youtu.be/cqS7GI4P6DA]*
- *"Is the Quran Preserved? Reading a Quran from the Prophet's Time - Adnan Rashid" (YouTube) [www.youtu.be/XUs7fhVmkaQ]*
- *ইসলামবিরোধীদের জবাব—Response To Anti-Islam [www.is.gd/3iCyeq]*

Scanned by CamScanner

নারীরা কি স্বল্পবুদ্ধির? তাদের অধিকাংশই কি জাহান্নামী?

আহমাদ আল-উবাইদুল্লাহ

ইসলাম অনুযায়ী অধিকাংশ নারী কেন জাহান্নামি?

নারী হয়ে জন্মানোর অর্থ কি স্বল্পবুদ্ধির অধিকারী হওয়া?

ইসলামবিদ্বেষীদের ওয়েবসাইটে প্রায়ই এই বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা করা হয়, যেখানে তারা দাবি করে, ইসলাম অনুযায়ী নারীরা কম বুদ্ধির অধিকারী কিংবা নারী হয়ে জন্মানোর অর্থ হলো স্বল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া। আমরা এই বিষয়ে রেফারেন্সগুলো দেখি।

'আবু সায়িদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের জন্য আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি নারীদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন—

হে নারীসমাজ, তোমরা সাদাকা করতে থাকো। কারণ, আমি দেখেছি জাহান্নামিদের মধ্যে তোমরাই বেশি।

তারা জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে, হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাকো আর স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ।

Scanned by CamScanner

বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আর কাউকে আমি দেখিনি।

তারা বললেন, আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির ত্রুটি কোথায়, হে আল্লাহর রাসুল?

তিনি বললেন, একজন নারীর সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা হ্যাঁ-বোধক উত্তর দিলেন। তখন তিনি বললেন, এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়িয অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে না? এবারও তারা সহমত পোষণ করলেন। নবিজি বললেন, এ হচ্ছে তাদের দ্বীনের ত্রুটি।'[১]

হাদিসটির একই রকম আরো বেশ কয়েকটি রিওয়ায়েত এসেছে।[২]

হাদিসগুলো হঠাৎ করে দেখলে অনেক মুসলিম হয়তো ঘাবড়ে যেতে পারেন। তার ওপর ইসলামবিদ্বেষীদের মন্তব্য আর মনগড়া ব্যাখ্যা দেখলে হয়তো অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু একটু ভালোভাবে বিশেষজ্ঞ আলিমদের ফাতওয়াগুলো দেখলে বোঝা যাবে যে, এখানে মোটেও সমগ্র নারী জাতিকে ছোট করা হয়নি।

উল্লিখিত হাদিসে বলা হচ্ছে—

> *আবু সায়িদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের জন্য আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি নারীদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, হে নারী-সমাজ, তোমরা সাদাকা করতে থাকো।*

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ করা যাক—

এক. এটা ছিল নবিজির সময়কার একটি ঘটনা। তখন আরবের নারীরা গৃহস্থালি কাজেই অভ্যস্ত ছিল। সাংসারিক কাজের পাশাপাশি তারা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করত।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩০৪, ১৪৬২, ১৯৫১, ২৬৫৮; *সহিহ মুসলিম* : ৭৯, ৮০; *মুসনাদু আহমাদ* : ৫৪৪৩
source—*http : //www.hadithbd.com/share.php?hid=24140*

[২] এই লিংকগুলো থেকে হাদিসগুলো দেখা যেতে পারে—
http : //www.hadithbd.com/share.php?hid=25393
http : //www.hadithbd.com/share.php?hid=7936
http : //www.hadithbd.com/share.php?hid=41220

Scanned by CamScanner

এ কারণে বাড়ির বাইরে ব্যবসা কিংবা অন্য কোনো কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে হতো না তাদের। মূলত এসকল কাজে তাদের অভিজ্ঞতাও ছিল না।

দুই. এটা সেই সময়, যখন আরবে ঈদের সময় এসেছিল এবং তাই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও উৎসাহিত করার চেষ্টা করছিলেন যাতে তারা সাদাকা বা দান-খয়রাত করে সাওয়াব বা পুণ্য অর্জন করতে পারে।

এবার দেখি, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই নারীদের কী বললেন...

তিনি নারীদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, হে নারী-সমাজ, তোমরা সাদাকা করতে থাকো। কারণ, আমি দেখেছি জাহান্নামিদের মধ্যে তোমরাই অধিক। তারা জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে, হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাকো আর স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ....একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আর কাউকে আমি দেখিনি।

এখানে ভালোভাবে লক্ষ করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সকল নারীকে সাদাকা করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। আর ঠিক তার পরপরই আরেকটি মন্তব্য করছেন যে, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা হবে নারী। এখানে জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা নারী কেন? তার উত্তরে আল্লাহর রাসুল বলছেন, 'তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাকো আর স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ।'

এবার আপনি হাদিসটির কথা প্রথমে ভুলে যান। বর্তমান বিশ্বের কথা চিন্তা করুন। কী দেখতে পাবেন? নারীরা আজ নিজেদের পরিবারের চাইতে নিজেদের ক্যারিয়ার আর চাকরি নিয়ে বেশি ব্যস্ত। বাড়িতে নিজের সন্তানকে সময় দেওয়ার মতো অবকাশ নেই; কারণ, তাকে তার অফিসের কাজেই ব্যস্ত থাকতে হয় অধিকাংশ সময়। সন্তান বাড়িতে বড় হচ্ছে কাজের লোকের কাছে। পশ্চিমা বিশ্বের দিকে তাকালে এর আধিক্য প্রকটভাবে চোখে পড়ে। দেখতে পাবেন, মায়ের সাহচর্যের অভাবে কীভাবে সন্তানেরা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় ভুগছে। তাদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে একাকিত্ববোধ, অপরাধপ্রবণতা। ফলে তারা নিজেদের এই মানসিক দৈন্য দূর করতে ছুটে চলেছে ব্যভিচারের দিকে। ছুটে চলেছে নেশা, মাদক আর চোরা-কারবারির জগতে। এগুলো কোথা থেকে শুরু হয়েছিল? পরিবার থেকেই। গবেষণা বলছে,

Scanned by CamScanner

পতিতালয়ে জন্মানো শিশুরা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় ভোগে। আর এখন যেসব মা ক্যারিয়ার ও চাকরি বাঁচাতে নিজের সন্তানের প্রতি উদাসীন, তাদের সন্তানেরা কোন পথে এগুচ্ছে তা আমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি।

শুধু এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। আপনি খুব ভালোভাবেই দেখতে পাবেন, আজ সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শান্তি নেই। ডিভোর্সের হার বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে যখন কোনো নারী কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে, সেখানে প্রণয়জাত সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে অফিসের স্টাফদের মধ্যে। কোনো নারী যখন তার বসের সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ছে আর তার সাথেই নিজের শারীরিক ও মানসিক চাহিদা মিটিয়ে চলেছে, তখন একই সাথে সেই নারীর মন থেকে যেমন তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে যাচ্ছে, ঠিক একইভাবে অফিসের বসও নিজের স্ত্রীর ব্যাপারে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে নারী স্টাফের প্রেমে পড়ার কারণে। এখন স্বাভাবিকভাবেই, এখানে দোষটা যেমন সেই নারীর আছে, তেমনি তার বসেরও আছে।

কিন্তু এর সূত্রপাত কীভাবে হয়েছিল? এর সূত্রপাত হয়েছিল যখন সেই নারী অফিসে তার বসের কাছে নিজে থেকে গিয়েছিল। তাহলে এখানে কার ভূমিকা বেশি? অবশ্যই সেই নারীর। আপনার কাছে দেয়াশলাই আছে, আবার কাগজও আছে। এখন আপনি দেয়াশলাই থেকে আগুন জ্বালালেন আর সেই আগুন কাগজের কাছে নিয়ে গেলেন। এবার যদি কাগজ জ্বলে ওঠে, এর জন্য আপনি কি কাগজকে বেশি দায়ী করবেন? কখনোই না। কারণ, জ্বলে ওঠার জন্য আগে দরকার আগুন, যেটা দেয়াশলাই থেকে এসেছে। আর তাই কাগজ যদি না-ও থাকত, তাহলে সেই আগুন দিয়ে অন্য কিছুও জ্বালানো যেত। ঠিক একইভাবে আমরা দেখতে পাই, যখন সমাজে নারীরা তাদের পরিবার ও স্বামী-সন্তানের প্রতি অবহেলা করে দুনিয়ার মোহের দিকে ছুটে যায়, সমাজ তখন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। এই কারণেই উক্ত হাদিসের এক জায়গায় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> *একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আর কাউকে দেখিনি।*

Scanned by CamScanner

এর অর্থ এটা নয় যে, এখানে পুরুষের কোনো দোষই নেই। কারণ, পুরুষও ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়; কিন্তু সমাজের এসব অনাচারের পেছনে নারীর ভূমিকা যে মুখ্য, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন—

> *তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাকো আর স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ।*

এর থেকে দুটি বিষয় বলা যেতে পারে—

এক. সেই সময়ের আরব মেয়েরা হয়তো তাদের স্বামীকে অনেক সময়ই অভিশাপ দিত আর স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতো, যেটা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সতর্ক করছিলেন।

দুই. বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব, অধিকাংশ নারীই আজ ইসলামের বিধান ছেড়ে দিয়ে পরিবারে স্বামী-সন্তানকে অবহেলা করে ক্যারিয়ারের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে; আর পর-পুরুষের সাথে অবাধে মেলামেশা করে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে ফেলছে। পরিণামে নিজের প্রবৃত্তির পেছনে দৌড়ানোর কারণে বিকৃতচিত্তের অধিকারী হয়ে পড়ছে, সেই সাথে শয়তানের প্ররোচনায় স্বামীর প্রতি কটূক্তি করতেও তারা দ্বিধাবোধ করছে না।

এই ধরনের নারীর সংখ্যা বরাবরই বেশি। এটা নারী হয়ে জন্মানোর কারণে নয়, বরং নারীদের নিজেদের কর্মের কারণে, যখন তারা ইসলামের বিধান ছেড়ে দিয়ে নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করতে শুরু করে। আর এই ধরনের নারীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই জাহান্নামে নারীদের সংখ্যা বেশি হবে।

এ সকল নারীর সংখ্যা কেবল পশ্চিমা সমাজেই বেশি তা নয়। ভারতবর্ষের তথা প্রাচ্যের নারীদের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যেটা ভারতীয় বৈষ্ণব গুরু স্বামী প্রভুপাদ-এর মন্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়—

'...একজন নারী তার স্বামীর কেবল সামান্যতম অন্যায়ের জবাবে দরকার পড়লে তাকে হত্যা করতেও ছাড়ে না। এমনকি তার ভাইও যেন তার স্বামীর নামে কিছু না বলে, সেজন্য তার ভাইকে পর্যন্তও সে হত্যা করতে পারে। এটাই হলো

Scanned by CamScanner

নারীর প্রকৃতি। অতএব, বস্তুজগতে যদি নারীরা পবিত্রতা এবং স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত হওয়ার শিক্ষা না পায়, তবে সমাজে শান্তি এবং উন্নতি বজায় থাকবে না'।[১]

তবে এটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, এই বিষয়গুলো শুধু বিশেষভাবে সেই সকল নারীর বৈশিষ্ট্য যারা ইসলামের বিধান ছেড়ে দিয়ে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো চলা শুরু করেছে। তাই, একজন মুমিন নারীর জন্য এটা কেবলই একটি সতর্কবাণী মাত্র। কারণ, ইসলামের বিধান মান্যকারী প্রকৃত মুমিন নারীগণ এই সকল নারীর মধ্যে পড়বেন না, ইনশা আল্লাহ, যারা নিজেরাই নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো চলে জাহান্নামের পথকে বেছে নিচ্ছে। তাই মুমিন বোনদের অনুরোধ করব, আপনারা ইসলামের বিধানগুলো পুরোপুরি মেনে চলুন, যাতে আল্লাহ তাআলার রহমতে আপনারা সবাই জান্নাতি নারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

উপরন্তু জাহান্নামে সব সময়ই নারীরা সংখ্যায় বেশি থাকবে না। হাদিস বিশারদ ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এই হাদিসগুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে, জান্নাত আর জাহান্নামে (দুই জায়গাতেই) নারীরা পুরুষের তুলনায় অধিক সংখ্যায় থাকবে।'[২]

ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলছেন, 'প্রথম দিকে জাহান্নামে নারীরা অধিক সংখ্যায় এবং জান্নাতে স্বল্প সংখ্যায় থাকবে। পরবর্তী সময়ে যখন তাদের গুনাহ বা পাপসমূহ পরিষ্কার হয়ে যাবে অথবা যখন তাদের পক্ষ থেকে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে, তখন তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অধিক হবে।'[৩]

---

[১] ["....a woman can respond to even a slight offense from her husband by not only leaving him but even killing him if required. To say nothing of her husband, she can even kill her brother. That is a woman's nature. Therefore, in the material world, unless women are trained to be chaste and faithful to their husbands, there cannot be peace or prosperity in society." (Purport of Srimad-Bhagavatam 9.14.37 by the founder of ISKCON, A.C Bhakti Vedanta Swami Prabhupada)

[source - https : //prabhupadabooks.com/sb/9/14/37]

[২] These Ahaadith are clear that females in Jannah and Jahannum will outnumber males by a great margin." (Sharh al-Nawawiy vol.9 pg.170; source - http : //tiny.cc/7ddrjz)

[৩] The women could be more in Jahannam and less in Jannah at the beginning. Thereafter, when they are cleansed of their sins or when intercession on their behalf is accepted, they would be entered into Jannah and they would outnumber the men there too.

(Fath al-Baari vol.6 pg.401; Hadith 3246 – Sifatul Jannah of Hafiz ibn Katheer pg.130; source - http : //tiny.cc/7ddrjz)

Scanned by CamScanner

তো, এবার দেখি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সকল আরবের নারীকে এরপর কী বললেন—

"

বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আর কাউকে আমি দেখিনি।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। এই হাদিসের প্রথমে প্রসঙ্গত আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের সেই নারীদের আসলে দান-সাদাকা করার কথা বলছিলেন আর সেটাই আসল উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তাহলে বাকি কথাগুলো বলে এভাবে তাদের বিব্রত করার কী মানে ছিল?

এখান থেকে যে বিষয়টি উঠে আসে তা হলো, বাকি কথাগুলো ছিল আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মন্তব্য। এই মন্তব্যগুলো তিনি ঠিক এমনভাবে করেছিলেন, যাতে তৎকালীন আরবের সেই মেয়েরা সাদাকার গুরুত্ব বুঝতে পারে বা সাদাকার প্রতি ঝুঁকে পড়ে, যার মাধ্যমে তারা সাওয়াব অর্জন করতে পারে এবং আখিরাতের আযাব থেকেও মুক্ত হওয়ার পথ খুঁজে পায়। আর ঠিক এ কারণেই আল্লাহর রাসুল প্রথমে জাহান্নামে নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা বললেন এবং পরে এর সাথে আরো কিছু কথা জুড়ে দিলেন, বুদ্ধি আর ধর্মের ব্যাপারে তাদের ত্রুটি বা কমতি রয়েছে। তাহলে এবার দেখি আল্লাহর রাসুল সেই ত্রুটি বা কমতিকে কীভাবে উপস্থাপন করেছেন—

তারা বললেন, দ্বীন ও বুদ্ধির ব্যাপারে আমাদের ত্রুটি কোথায়, হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, একজন নারীর সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা হ্যাঁ-বোধক উত্তর দিলেন। তখন নবিজি বললেন, এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়িয (মাসিক ঋতুস্রাবজনিত) অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকে না? এবারও তারা একমত হলেন। নবিজি এবার বললেন, এ হচ্ছে তাদের দ্বীনের ত্রুটি।

এখন প্রথম পয়েন্টটি লক্ষ করুন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন—

Scanned by CamScanner

“

একজন নারীর সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা হ্যাঁ-বোধক উত্তর দিলেন। তখন নবিজি বললেন, এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়—

এক. আমরা প্রথমেই দেখেছি, এই কথাগুলো আল্লাহর রাসুল আরবের সেই সকল নারীকে বলছিলেন, যারা কেবল গৃহস্থালি কাজে অভ্যস্ত ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে খুব বেশি জ্ঞান ছিল না। বর্তমানেও আমরা দেখে থাকব যে, যদিও নারীরা আজ বাইরে কাজ করছে, কিন্তু তারপরও বিশ্বের অনেক জায়গাতেই নারীরা কেবল গৃহস্থালি দায়িত্ব সামলাচ্ছেন আর তাদের স্বামীরা ঘরের বাইরের কাজগুলোয় বেশি পারদর্শী।

দুই. ঘরের বাইরের কাজে যেসব নারী অভ্যস্ত, তাদের ক্ষেত্রেও হাদিসের বক্তব্য প্রযোজ্য। এটা বুঝতে হলে কুরআনের একটি আয়াত প্রথমে আমাদের দেখতে হবে। আল্লাহ তাআলা এক্ষেত্রে নারীদের উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ নিয়ম জারি করেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য আর লেনদেনের ক্ষেত্রে[১] একজন পুরুষ যদি সাক্ষ্য দিতে না পারে, তবে তার পরিবর্তে দুজন নারী সাক্ষ্য দেবে, যাতে একজন নারী ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا

---

[১] দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের মতো—হানাফি মাযহাব অনুসারে এ বিধান কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য আর ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রেই নয়; বরং হুদুদ ও কিসাস ছাড়া সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন—বিবাহ, তালাক, দাসমুক্তি, ওকালতি, অসিয়ত ইত্যাদি। অন্যান্য মাযহাবে বিধান আরও কঠিন। তাদের মতে, সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে দুজন নারী একজন পুরুষের সমকক্ষ কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য আর ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের একক বা যৌথ কোনো সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। আর এককভাবে একজন নারীর সাক্ষ্য কেবল কয়েকটি ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য হয়। যথা—সন্তান প্রসবের সাক্ষ্য, রামাদানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য, দুগ্ধপানের সাক্ষ্য, মেয়েদের গোপন কোনো ত্রুটি থাকার সাক্ষ্য। [বিস্তারিত দেখতে—*আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা,* খণ্ড : ২৬; পৃষ্ঠা : ২২৬-২২৮]—শারয়ি নিরীক্ষক

Scanned by CamScanner

دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

.....

হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পরস্পর ঋণ দেওয়া-নেওয়া করো, তখন তা লিখে নাও। আর তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক যেন ন্যায়ভাবে তা লিখে দেয় এবং আল্লাহ যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন—সেইরূপ লিখতে কোনো লেখক যেন অস্বীকার না করে। অতএব, তার লিখে দেওয়াই উচিত। আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দিয়ে লিখিয়ে নেয় এবং সে যেন স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্র কম-বেশি না করে। এরপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সংগতভাবে তা লেখায়। আর তোমাদের মধ্যে দুজন পুরুষকে (এই আদান-প্রদানের) সাক্ষী করো। যদি দুজন পুরুষ না পাও, তাহলে সাক্ষীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পছন্দ করো তাদের মধ্য থেকে একজন পুরুষ ও দুজন নারীকে সাক্ষী করো; যাতে নারীদ্বয়ের একজন ভুলে গেলে যেন অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

.....

.....

আর যখন (সাক্ষ্য দিতে) ডাকা হয়, তখন যেন সাক্ষীরা অস্বীকার না করে। (ঋণ) ছোট হোক, বড় হোক, তোমরা মেয়াদ-সহ লিখতে কোনোরূপ অলসতা কোরো না। এ লেখা আল্লাহর কাছে ন্যায্যতর ও সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার অধিক নিকটতর; কিন্তু তোমরা পরস্পরে ব্যবসায় যে নগদ অর্থ আদান-প্রদান করো, তা না লিখলে কোনো দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পর বেচা-কেনা করো, তখন সাক্ষী রেখো। আর কোনো লেখক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং না কোনো সাক্ষী। যদি তোমরা তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করো, তাহলে তা হবে তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।[১]

.....

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮২

Scanned by CamScanner

তাহলে দেখুন, এখানে উক্ত আয়াত অনুযায়ী, একজন পুরুষের পরিবর্তে দুজন নারীকে সাক্ষী হিসেবে নেওয়ার কারণ হলো—নারীদের একজন কিছু ভুলে গেলে যাতে অন্যজন তাকে সেই বিষয়টি মনে করিয়ে দিতে পারে।

ইসলামবিদ্বেষী তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক নাস্তিক আর মুক্তমনারা এবার হয়তো চিৎকার করে বলতে শুরু করবে, এটা অন্যায়, অবিচার! কিন্তু তারা যে কতটা বিজ্ঞানমনস্ক তা তাদের অজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায়। কারণ, বিভিন্ন সায়েন্টিফিক রিপোর্ট অনুযায়ী, নারীরা প্রায় সময়ই ক্ষণস্থায়ীভাবে স্মৃতিভ্রংশ (memory loss) হতে পারেন তাদের শারীরবৃত্তীয় নানারূপ জটিলতা, যেমন—গর্ভাবস্থার প্রভাব, মেনোপজ বা রজোনিবৃত্তির প্রভাব, বন্ধ্যাত্বজনিত প্রভাব ইত্যাদির কারণে। নিচে এমন কিছু রিপোর্টের রেফারেন্স দেওয়া হলো :

৪০% নারী মাসিকপূর্ব উপসর্গে ভুগে থাকেন—

Psychiatry in Practice, April 1983 issue states : "Forty percent of women suffer from pre-menstrual syndrome in some form and some have their lives severely disrupted by it. Dr Jill Williams, general practitioner from Bury, gives guidelines on how to recognise patients at risk and suggests a suitable treatment."[১]

মাত্র ১০% নারীই কেবল এই ধরনের উপসর্গের কথা ডাক্তারকে সাহস করে বলতে পারেন, বাকিরা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ও অন্যান্য কারণে ডাক্তারের শরণাপন্নই হন না—

George Beaumont reporting on the workshop held at the Royal College of Obstreticians and Gynaecologists in London on pre-menstrual syndrome, says : "Some authorities would argue that eighty percent of women have some degree of breast and abdominal discomfort which is pre-menstrual but that only about 10 percent complain to their doctors** - and then only because

---

[১] *Psychiatry in Practice*, April 1993, p.14.

Scanned by CamScanner

of severe tenderness of the breasts and mental depression**... Other authorities have suggested that pre-menstrual syndrome is a new problem, regular ovulation for twenty years or more being a phenomenon caused by 'civilisation', 'medical progress' and an altered concept of the role of women."[১]

মাসিক পূর্ববর্তী অবস্থায় নারীদের বিভিন্ন মানসিক জটিলতা সৃষ্টি হয়—

"Many studies have reported an increased likelihood of various negative affects during the pre-menstrual period. In this affective category are many emotional designations including irritability, depression, tension, anxiety, sadness, insecurity, lethargy, loneliness, tearfulness, fatigue, restlessness and changes of mood. In the majority of studies, investigators have found it difficult to distinguish between various negative affects, and only a few have allowed themselves to be excessively concerned with the differences which might or might not exist between affective symptoms."[২]

মাসিক-পূর্ব উপসর্গ মনোযোগ (concentration) এবং স্মৃতি (memory)-র ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে—

"Reduced powers of concentration and memory are familiar aspects of the pre-menstrual syndrome and can only be remedied by treating the underlying complaint.... As many as 80 percent of women are aware of some degree of pre-menstrual changes, 40 percent are substantially disturbed by them, and between 10 and 20 percent are seriously disabled as a result of the syndrome."[৩]

---

[১] *Psychiatry in Practice*, April 1993, p.18

[২] *Psychological Medicine*, Monograph Supplement 4, 1983, Cambridge University Press, p.6

[৩] *The Pre-menstrual Syndrome* by C. Shreeves

Scanned by CamScanner

মাসিক পূর্বাবস্থায় নারীদের আচরণে অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পায়—

"A significant relationship between the pre-menstrual phase of the cycle and a variety of specific and defined forms of behaviour has been reported in a number of studies. For the purpose of their review, these forms of behaviour have been grouped under the headings of aggressive behaviour, illness behaviour and accidents, performance on examination and other tests and sporting performance."[১]

গর্ভাবস্থায় নারীরা বহুবিধ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় ভোগেন—

Psychiatry in Practice, October-November 1986, we learn that : "In an experiment 'Cox' found that 16 percent of a sample of 263 pregnant women were suffering from clinically significant psychiatric problems. Eight percent had a depressive neurosis and 1.9 percent had phobic neurosis. This study showed that the proportion of pregnant women with psychiatric problems was greater than that found in the control group but the difference only tended towards significance."[২]

গর্ভাবস্থার পরও নারীরা নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় ভোগেন—যা তারা অনেক সময় নিজেরাও ধরতে পারেন না—

Dr. Ruth Sagovsky writes : "The third category of puerperal psychiatric problems is post-natal depression. It is generally agreed that between 10 to 15 percent of women become clinically depressed after childbirth. These mothers experience a variety of symptoms but anxiety, especially over the baby, irritability, and excessive fatigue are common. Appetite is usually decreased and

---

[১] *Psychological Medicine*, Monograph Supplement 4, 1983, Cambridge University Press, p.7

[২] *Psychiatry in Practice*, October-November, 1986, p.6

Scanned by CamScanner

often there are considerable sleep difficulties. The mothers lose interest in the things they enjoyed prior to the baby's birth, and find that their concentration is impaired. They often feel irrational guilt, and blame themselves for being 'bad' wives and mothers. Fifty percent of these women are not identified as having a depressive illness. Unfortunately, many of them do not understand what ails them and blame their husbands, their babies or themselves until the relationships are strained to an alarming degree."[১]

নারীরা যে সকল সমস্যায় ভোগেন, তা তারা নিজেরাও ঠিকভাবে জানেন না—

"...Women never know what their body is doing to them... some reporting debilitating symptoms from hot flashes to night sweat, sleeplessness, irritability, mood swings, short term memory loss, migraine, headaches, urinary inconsistence and weight gain. Most such problems can be traced to the drop-off in the female hormones oestrogen and progesterone, both of which govern the ovarian cycle. But every woman starts with a different level of hormones and loses them at different rates. The unpredictability is one of the most upsetting aspects. Women never know what their body is going to do to them..."[২][৩]

এখন কেউ আমায় বলুন যখন আল্লাহ বলছেন—'একজন পুরুষ ও দুজন নারীকে সাক্ষী করো; যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।'—তখন এটা অবিচার না আরও অধিক সুবিচার?

---

[১] *Psychiatry in Practice*, May, 1987, p.18

[২] Dr. Jennifer al-Knopf, Director of the Sex and Marital Therapy Programme of Northwestern University on the phenomenon of menopause in an article in Newsweek International, May 25th 1992

[৩] রিপোর্টগুলো নেওয়া হয়েছে এখান থেকে—http : //tiny.cc/7ddrjz

Scanned by CamScanner

সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ আমাদের সমস্যাগুলো ভালোভাবেই জানেন, আর সেভাবেই তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

.....

মুমিনগণ, তোমাদের কারো যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন অসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হতে দুজন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে সালাতের পর তাদের অপেক্ষমাণ রাখবে। অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, 'আমরা ওর বিনিময়ে কোনো মূল্য গ্রহণ করব না; যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে আমরা নিশ্চয় পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব।[১]

.....

তাফসিরে আহসানুল বায়ানে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—

'তোমাদের মধ্য থেকে'-এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, 'মুসলিমদের মধ্য থেকে', আবার কেউ বলেন, 'অসিয়তকারীর গোত্রের মধ্য থেকে।' অনুরূপ 'তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য থেকে'—এরও দুটি ভাবার্থ হতে পারে, অর্থাৎ অমুসলিম (আহলে কিতাব) হতে পারে অথবা অসিয়তকারীর গোত্র ব্যতীত অন্য কোনো গোত্রের লোক উদ্দেশ্য হতে পারে।'[২]

আবার লক্ষ করি—

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

---

[১] সুরা মায়িদা, আয়াত : ১০৬

[২] *তাফসিরে আহসানুল বায়ান*

Scanned by CamScanner

.....

তাদের ইদ্দতপূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদের রেখে দাও, নাহয় তোমরা তাদের যথাবিধি পরিত্যাগ করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে দুই জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখো; তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দাও। এটা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যেকেউ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর যেকেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন।[১]

.....

আরও দেখুন—

.....

আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। [১৮]

.....

.....

তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে; যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী।[২]

.....

এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—পুরুষ হিসেবে স্বামীর সাক্ষ্য এবং স্ত্রী হিসেবে নারীর সাক্ষ্য পরস্পর সমতুল্য। তাহলে এবার ভাবুন, মুক্তমনারা কতটা মিথ্যাবাদী!

এবার আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ কথাটুকু দেখি, তিনি বলেন, 'আর হায়িয (মাসিক ঋতুস্রাবজনিত) অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে না? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ হচ্ছে তাদের দ্বীনের ত্রুটি।'

প্রথমত, এখানে বলা হয়নি—তারা মাসিক ঋতুস্রাবজনিত অবস্থার কারণে সালাত আর সিয়ামের মতো ধর্মীয় কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারে না বলে তারা গুনাহের সম্মুখীন হবে কিংবা জাহান্নামে যাবে; বরং, এখানে কেবল এটা নির্দেশ করা হয়েছে, পুরুষের তুলনায় নারীদের ধর্মীয় কার্যাবলির দায়ভার তুলনামূলক কম তাদের শারীরিক আর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কারণে। এটার অর্থ এই নয়, এর

---

[১] সুরা তালাক, আয়াত : ২

[২] সুরা নুর, আয়াত : ৮

Scanned by CamScanner

জন্য তাদের দোষারোপ করা হবে; কেননা, আল্লাহ তাআলা কাউকেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না।

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

.....

আল্লাহ কাউকেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভালো উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে সে তার (প্রতিফল পাবে)। (হে মুমিনগণ, তোমরা এভাবে দুআ করো), 'হে আমাদের প্রতিপালক, যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী কোরো না। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক, এমন ভার আমাদের ওপর অর্পণ করবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের পাপ মোচন করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফির) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য ও) জয়যুক্ত করুন।[১]

.....

শাইখ মুহাম্মাদ আলি আল-হানুতি তার ফাতওয়ায় বলছেন—

'...প্রশ্নোক্ত হাদিসে একজন নারীকে আদৌ ছোট করা হচ্ছে না! ইসলাম নারীকে সুউচ্চ মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করেছে এবং কুরআনের বহু আয়াত এবং প্রথম যুগের মুসলিমদের অভ্যাস, রীতিনীতি এই বাস্তব বিষয়টিকে সাক্ষ্য দেয় যে, নারী জীবনের নানা ভূমিকায় পুরুষের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই সে কখনোই পুরুষের চেয়ে ছোট নয়। ইসলাম কখনোই সমাজে নারীর ভূমিকাকে ছোট করে দেখেনি। আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে তুলনামূলক বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের কিছু উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬

Scanned by CamScanner

আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য উপস্থিত করেছেন ফিরআউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে (প্রার্থনা করে) বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক, আপনার নিকট জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন জালিম সম্প্রদায় হতে।

আর (তিনি আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন) ইমরান-তনয়া মারইয়াম, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে আমার (সৃষ্ট) রূহ হতে ফুঁকে দিয়েছিলাম। সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল; আর সে ছিল অনুগতদের একজন।[১]

সর্বশক্তিমান আল্লাহ ও তাঁর নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তম নারীদের প্রশংসা করেছেন। আমরা আমাদের ইসলামিক উৎসগুলো থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো দেখি—

নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী—এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।[২]

বিশ্বাসী পুরুষরা ও বিশ্বাসী নারীরা একে অন্যের সহায়ক, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতিই আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তো প্রবল পরাক্রান্ত, মহাপ্রজ্ঞাবান।[৩]

[১] সুরা তাহরিম, আয়াত : ১১-১২

[২] সুরা আহযাব, আয়াত : ৩৫

[৩] সুরা তাওবা, আয়াত : ৭১

Scanned by CamScanner

ইসলামে পুরুষদের খারাপ কাজে নিষেধ করার জন্য নারীদের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। এটাই প্রমাণ করে, নারীরা পুরুষের থেকে ধর্মীয় বিষয় ও বুদ্ধিতে ছোট নয়; কারণ, পুরুষরা ভুল করলে নারীরা তাদেরকে সংশোধন করে দেবে এবং খারাপ কাজে নিষেধ করবে, এ অধিকার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নারীদের দিয়েছেন।

তিন. এই হাদিসটি বিশুদ্ধ বা নির্ভরযোগ্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে নারীদের সম্বন্ধে লিঙ্গ বা জাতিগত বিষয়ের ভিত্তিতে কিছু বলেননি। তিনি এখানে সেই সকল গুনাহগার বা পাপী লোকের কথা বলেছেন, যারা তাদের ভবিষ্যতে যা যা করবে তার জন্য দায়ী হবে। যদি কোনো পুরুষ সেই একই কাজ করে, তবে সে-ও সেই একই জাহান্নামে যাবে। এটাই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে আপনি হাদিসটিকে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

চার. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাখ্যা করেছেন ধর্মীয় বিষয়ের কমতির ব্যাপারটি, যা খ্রিষ্টান মিশনারিদের ধর্মীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা বা অনুবাদ থেকে আলাদা। তিনি বলেছেন, মাসিক ঋতুস্রাবের কারণে ধর্মীয় কাজগুলো পালনের জন্য তোমাদের তুলনামূলক কম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যখন তিনি বুদ্ধির কমতি নিয়ে বললেন, তখন তিনি মস্তিষ্কের ক্ষমতা বা মেধাপ্রসূত ধারণক্ষমতা বা দক্ষতা নিয়ে কিছু বলেননি। একজন নারীকে মা হিসেবে বা সন্তান-পালনকারিণী হিসেবে অথবা গর্ভবতী হিসেবে অনেক বোঝা বহন করতে হয়। এগুলো নিয়ে সে যেন একটা ঘড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকে; আর একারণেই কোনো নারীর এমনতর পরিস্থিতির জন্য কোনো একজন পুরুষের (যে পুরুষ কেবল একটি পেশার সাথেই যুক্ত) চেয়ে তার অধিক পরিমাণে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। আল্লাহ পরম করুণাময়, তাই তিনি নারীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তার পথ সহজ করে দিয়েছেন যাতে করে সে কোনো সাক্ষ্য দেওয়ার সময় পুরোপুরি দায়ী না হয়। কোনোভাবেই এখানে নারীকে অবমাননা করা হচ্ছে না; আর এমন কোনো বিধানও দেওয়া হচ্ছে না, যা বৈষম্যমূলকভাবে নারীকে ছোট করবে।'[১]

---

[১] ....The Hadith in question does not depict a woman as inferior; not at all! Islam honours women very high and many verses of the Qur'an and practices of the early Muslims bear witness to the fact that woman is, at least, as vital to life as man is, and that she is not inferior to man in any way (in neither religion or intelligence). Islam never belittles woman or underestimates her role in the society. Allah has made this clear in the Glorious Qur'an, by stating shining examples of some women for the believers-

Scanned by CamScanner

উপসংহার

সুতরাং, উল্লিখিত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার—নারীরা পুরুষের থেকে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে ভিন্ন। তাই, ইসলামে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং অধিকারও তাদের প্রকৃতির সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। উপরিউক্ত হাদিসগুলোতে আল্লাহর রাসুল নারীদের ছোট করেননি; বরং তিনি কতগুলো প্রাকৃতিক ও বাস্তব সত্যকে তুলে ধরেছেন এবং সেগুলোকে তৎকালীন আরবের নারীদের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যাতে তারা সাদাকা বা দান-খয়রাতের মতো ধর্মীয় কাজে উৎসাহিত হয় এবং দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে আরও বেশি মনোযোগী হয়ে ওঠে। মুক্তমনা আর ইসলাম-বিদ্বেষীদের জন্য আমি তাই কেবল একটি আয়াতের

---

male and female- to emulate. In this context, the Glorious Qur'an says, 'And Allah citeth an example for those who believe : the wife of Pharaoh when she said : My Lord! Build for me a home with thee in the Garden, and deliver me from Pharaoh and his work, and deliver me from evil doing folk; and Mary, daughter of Imran, whose body was chaste, therefor We breathed therein something of Our Spirit. And she put faith in the words of her Lord and His Scriptures, and was of the obedient.' (*At-Tahrim* : 11-12)

Allah Almighty and prophet Muhammad praised the good women, let us look at the following quotes from our Islamic sources :

"For Muslim men and women,- for believing men and women, for devout men and women, for true men and women, for men and women who are patient and constant, for men and women who humble themselves, for men and women who give in Charity, for men and women who fast (and deny themselves), for men and women who guard their chastity, and for men and women who engage much in God's praise,- for them has God prepared forgiveness and great reward. (The Noble Quran, 33 : 35)"

"The Believers, men and women, are protectors one of another : they enjoin what is just, and forbid what is evil : they observe regular prayers, practise regular charity, and obey God and His Apostle. On them will God pour His mercy : for God is Exalted in power, Wise. (The Noble Quran, 9 : 71)"

In islam women clearly have the right to forbid men what is evil, so this proofs women aren't inferior to men in religion or intelligence, since Allah swt gives women the right to correct men when they are wrong, and to forbid them the evil.

The Hadith is authentic, the Prophet (SAAWS) talks about women not as a gender or a race or ethnic. He talks about sinful people who deserve what they will have of destiny. If a man does the same, he will have the same Hell. This is the only way you can interpret the Hadith.

The Prophet (SAAWS) has explained what he says of shortage of deen which is different from the chrisitian missionaries interpretation or translation of deen. He says, you are less commended to practice the deen, because of menstruation. When he talks about lack of intellect, he does not talk about potential of brain or capacity of talent or skill. A woman is overloaded by being a mother or a babysitter or pregnant. All these carriers are around the clock, because of what she is, she is always likely to forget more than a man who is devoted to one career only. Allah is merciful, he forgives her and makes it easy for her when she is not fully responsible to give a full testimony as a witness. Nothing of that is defaming a woman, there is not a law that discriminates a woman to put her down."

[Fatwa of Sheikh Muhammad Ali Al-Hanooti; source - http : //tiny.cc/jddrjz]

Scanned by CamScanner

রেফারেন্স দিয়েই এই লেখাটি শেষ করব, যেখানে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করে দিয়েছেন, সম্মান ও মর্যাদার মানদণ্ড লিঙ্গ, জাতিভেদ, পেশা, বর্ণ ইত্যাদি কিছুই না বরং আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় বিষয় হলো তাকওয়া (আল্লাহর প্রতি সচেতনতা, ন্যায়পরায়ণতা, ধার্মিকতা ইত্যাদি)।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন—যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।[১]

[১] সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩

Scanned by CamScanner

দাসপ্রথা ও ইসলাম

মুহাম্মাদ সাদাত

ভূমিকা

এক. দাসপ্রথা নিয়ে কিছু কথা : দাসপ্রথা নিয়ে অনেক প্রশ্নই বর্তমান সমাজে প্রচলিত। এমনকি সাধারণ মুসলিমদের মনেও এ নিয়ে নানাবিধ খটকার উদয় হয়ে থাকে। মজার ব্যাপার হলো—দাসপ্রথা ইসলাম-প্রবর্তিত কোনো ব্যবস্থা নয়। আজ হতে প্রায় পৌনে চার হাজার বছর আগের ব্যাবিলনীয় Code of Hammurabi-তেও দাসপ্রথার অস্তিত্ব পাওয়া যায়; কিন্তু কেন যেন ইসলামের সমালোচনায় দাসপ্রথা একটি বেশ মুখরোচক বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়, আর আলোচনার ভঙ্গিটাও এমন থাকে, যেন পাঠকের কাছে মনে হতে থাকবে দাসপ্রথার মতো ঘৃণ্য একটি ব্যবস্থাকে ইসলাম জন্ম দিয়েছে বা উন্নীত করেছে। অথচ, আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ইসলাম দাসপ্রথার বিরুদ্ধে যে যুগান্তকারী ব্যবস্থা নিয়েছিল, ক্রীতদাসকে ভ্রাতৃত্বের যে মর্যাদা দিয়েছিল, নেতৃত্বের যে সুযোগ দিয়েছিল, যেকোনো নিরপেক্ষ বিশ্লেষক তার প্রশংসা না করে পারবেন না।

দুই. কুরআন এবং হাদিসে দাস-দাসী ও দাসপ্রথার অবস্থান : মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে কুরআনের কিছু আয়াত এবং কিছু হাদিস থেকে দাস-দাসী ও দাসপ্রথার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করি।

Scanned by CamScanner

দাসপ্রথা নিয়ে কুরআনের কিছু আয়াত

» **আয়াত-১** : দাসমুক্তকরণ ধর্মের ঘাঁটি

অতঃপর সে (ধর্মের) দুর্গম গিরিপথে[১] প্রবেশ করেনি। আপনি জানেন, সে দুর্গম গিরিপথ কী? তা হচ্ছে ক্রীতদাসকে মুক্তি প্রদান অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান—ইয়াতিম আত্মীয়কে অথবা ধূলি-ধূসরিত মিসকিনকে, অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে দয়া ও সবরের উপদেশ দেয়।[২]

» **আয়াত-২** : মুক্তিকামী ক্রীতদাসের জন্য সম্পদ ব্যয় করা বড় সৎকাজ

সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হলো—ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং সমস্ত নবি-রাসুলের ওপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই ভালোবাসায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে।[৩]

» **আয়াত-৩** : নিজেদের সমান হয়ে যাওয়ার ভয়ে দাস-দাসীদের দান না করা আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করার নামান্তর

আল্লাহ তাআলা জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। কিন্তু যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীন দাস-দাসীদের স্বীয় জীবিকা থেকে কিছুই দেয় না, (এই ভয়ে যে) তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করে?[৪]

---

[১] عقبة বলা হয় পাহাড়ের মাঝে রাস্তা বা গিরিপথকে। সাধারণত এ পথ বড় সংকটময়। মানুষের সেই কষ্টকে বোঝানোর জন্য এটি একটি উদাহরণ যা নেক কাজ করার পথে শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং মনের কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে করতে হয়। পাহাড়ের ঐ পথে চড়া যেমন অনেক কঠিন। তেমনি ভালো কাজ করাও বড় কঠিন।—*ফাতহুল কাদির*

[২] সুরা বালাদ, আয়াত : ১১-১৭

[৩] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৭৭, প্রাসঙ্গিক অংশ

[৪] সুরা নাহল, আয়াত : ৭১

Scanned by CamScanner

» **আয়াত-৪** : নিঃস্ব হলেও সৎকর্মপরায়ণ দাস-দাসীদের বিবাহ দিয়ে দিতে হবে

তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[১]

দাস-দাসী ও দাসপ্রথা-সম্পর্কিত কিছু হাদিস

» **হাদিস-১** : স্বাধীন ব্যক্তিকে কেনাবেচা নিষিদ্ধ

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব—**এক.** যে ব্যক্তি আমার নামে শপথ করে, অতঃপর বিশ্বাসঘাতকতা করে; **দুই.** যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে (ক্রীতদাস হিসেবে) বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করে; **তিন.** যে ব্যক্তি কোনো মজুরকে নিযুক্ত করে তার থেকে পরিপূর্ণ কাজ আদায় করে নেয় অথচ তার পারিশ্রমিক প্রদান করে না।'[২]

» **হাদিস-২** : দাস-দাসীর অধিকার

আল-মারুর ইবনু সুওয়াইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের দাসেরা তোমাদের ভাই, যাদের ওপর আল্লাহ তোমাদের ক্ষমতা দিয়েছেন। কাজেই কারো নিয়ন্ত্রণে যদি তার ভাই থাকে, তবে সে যা খাবে তাকেও তা-ই খাওয়াবে, সে যা পরবে তাকেও তা-ই পরাবে। তাদের ওপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দেবে না, যা তারা বহন করতে অক্ষম। যদি এমনটা করতেই হয়, তবে তাদের সহযোগিতা করবে।'[৩]

---

[১] সুরা নুর, আয়াত : ৩২

[২] *সহিহুল বুখারি* : ২২২৭

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ২৫৪৫

Scanned by CamScanner

» **হাদিস-৩** : দাস-দাসীকে সম্মানজনকভাবে সম্বোধন করা

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ''তোমাদের কেউ যেন এমন কথা না বলে, 'তোমার প্রভুকে খাওয়াও', 'তোমার প্রভুকে অযু করাও', 'তোমার প্রভুকে পান করাও'; আর (দাস-দাসীরা) যেন বলে, 'আমার মনিব (সাইয়্যিদ)' বা 'আমার অভিভাবক (মাওলা)'। আর তোমাদের কেউ যেন না বলে, 'আমার দাস/বান্দা (আবদ)' কিংবা 'আমার দাসী/বান্দি (আমাত)'; বরং বলবে 'আমার বালিকা/মেয়ে (ফাতাত)' এবং 'আমার বালক/ছেলে (গোলাম)'।'[১]

» **হাদিস-৪** : দাস-দাসীদের ন্যায়বিচার লাভের অধিকার

সামুরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি কেউ তার ক্রীতদাসকে হত্যা করে, আমরা তাকে হত্যা করব, আর কেউ যদি তার ক্রীতদাসের নাক কেটে দেয়, আমরাও তার নাক কেটে দেবো।[২]

» **হাদিস-৫** : দাস-দাসীর ওপর অপবাদ আরোপের পরিণাম

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেউ যদি তার ক্রীতদাসকে অপবাদ দেয়; অথচ সে তা হতে পবিত্র, তবে তাকে (অপবাদ আরোপকারীকে) কিয়ামতের দিন বেত্রাঘাত করা হবে। তবে হ্যাঁ, যদি (আল্লাহর বিচারে সেই ক্রীতদাসটি) এমন হয়, যেমন সে (মালিক) বলেছে (তাহলে মালিককে বেত্রাঘাত করা হবে না)।[৩]

» **হাদিস-৬** : দাস-দাসীকে চড় মারার শাস্তি

মুআবিয়া ইবনু সুওয়াইদ থেকে বর্ণিত, একবার আমি আমাদের এক ক্রীতদাসকে চড় মেরে পালিয়ে গেলাম। ঠিক দুপুরের আগে ফিরে এসে বাবার পেছনে সালাত আদায় করলাম। এরপর বাবা ক্রীতদাসকে ডেকে আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন,

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২৫৫২

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৫১৫

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৬৮৫৮

Scanned by CamScanner

সে তোমার সাথে যা করেছে, তুমিও তার সাথে সেটাই করো। কিন্তু ক্রীতদাসটি আমাকে কোনো আঘাত না করে ক্ষমা করে দিলো। তখন বাবা বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আমরা বনু মুকাররিন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম এবং আমাদের একটিমাত্র ক্রীতদাসী ছিল। একবার আমাদের একজন তাকে চড় মারল। এই খবর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছল। তখন তিনি বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও। লোকজন বলল, সে ছাড়া তাদের আর কোনো সেবক নেই। তখন তিনি বললেন, তাহলে তার কাছ থেকে তারা সেবা গ্রহণ করতে থাকুক। তবে যেদিন তার প্রয়োজন মিটে যাবে সেদিন তাকে মুক্ত করে দিতে হবে।[১]

» **হাদিস-৭** : দাসীকে বিবাহে উৎসাহ প্রদান

আবু মুসা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যার একজন ক্রীতদাসী আছে আর সে তাকে শিক্ষাদীক্ষা দেয়, তার সাথে ভালো ব্যবহার করে, এরপর তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে নেয়, সে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে।[২]

দাসত্বের পথ এবং ইসলাম

সর্বশেষ আসমানি কিতাব পবিত্র কুরআন যখন নাযিল হচ্ছিল, তখন শুধু আরবে নয় বরং সারা দুনিয়ায় ক্রীতদাসপ্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বাধীন মানুষ দাসত্ব বরণ করত প্রধানত দুটি উপায়ে—

এক. স্বাধীন ব্যক্তিকে বেচাকেনার মাধ্যমে ক্রীতদাস বানানো : এই পথটি ইসলামে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইসলামে কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে কেনাবেচা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।[৩]

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৬৫৮

[২] *সহিহুল বুখারি* : ২৫৮৪

[৩] দ্রষ্টব্য : হাদিস-১

Scanned by CamScanner

দুই. যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাস বানানো : যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাস বানানো সেই সময় একটি স্বাভাবিক রীতি ছিল। কোনো মুসলিম যদি যুদ্ধে অমুসলিমদের হাতে বন্দি হতো তাকেও এই পরিণতি বরণ করতে হতো। ইসলামে যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাস বানানো জরুরি কোনো বিষয় নয়। মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করতে পারেন, আবার বিনা মুক্তিপণেও মুক্ত করতে পারেন, যুদ্ধবন্দি বিনিময় করতে পারেন কিংবা প্রয়োজনবোধে অন্যান্য রাষ্ট্রের রীতি অনুযায়ী দাস-দাসীও বানাতে পারেন। তবে কোনো রাষ্ট্রের সাথে মুসলিমদের যদি এমন কোনো চুক্তি থাকে যে, তারা তাদের যুদ্ধবন্দিদের দাস বানাতে পারবে না, তবে সেই চুক্তি রক্ষা করা মুসলিমদের জন্য জরুরি।

কেন ইসলামে এই দাসপ্রথা রহিত করা হলো না?

ইসলাম একটি বাস্তব ধর্ম। এর মানে হলো, ইসলাম এমন একটি ধর্ম—যা ব্যবহারিক জীবনে পালন করতে গিয়ে মানুষ কোনো বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় না। ইসলাম এমন কোনো ধর্ম নয় যে, কেউ এক গালে চড় মারলে আরেকটা গাল পেতে দিতে বলবে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নিজ অনুসারীদের বিপদ বা অস্তিত্ব সংকটের মুখে ফেলে দেওয়ার ধর্ম ইসলাম নয়। কারণ, মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দু-বার দংশিত হয় না।[১] যেখানে মুসলিমরা অমুসলিমদের হাতে যুদ্ধবন্দি হলে তাদেরকেও দাসত্ব বরণ করতে হতো, সেখানে ইসলাম যদি একই সুযোগ না রাখত, তবে তা হতো শত্রুর হাতে এক বিরাট মারণাস্ত্র তুলে দেওয়ার নামান্তর। কাজেই যতদিন মুসলিমদের জন্য এই নিশ্চয়তা না আসে যে, তাদের যুদ্ধবন্দিদের দাস-দাসী বানানো হবে না, ততদিন পর্যন্ত মুসলিমদের জন্যও এই সুযোগ রহিত করার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

দাসত্বের এই পথ বন্ধ করার উপায়

ইসলামে দাসত্বের এই পথটি যদিও খোলা রয়েছে, তথাপি এটি একটি বন্ধযোগ্য পথ, যা বন্ধ করার চাবি অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের হাতে দেওয়া আছে। যেকোনো অমুসলিম রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে এই ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে—'আমরা একে অপরের যুদ্ধবন্দিদের দাস-দাসী বানাব না।' এভাবে দাসত্বে প্রবেশের এই উন্মুক্ত পথটি বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব।

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ৫৯২৮

Scanned by CamScanner

ইসলামে দাসমুক্তির পথসমূহ

এক. যাকাত : ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো যাকাত। আর এই যাকাতের একটি খাত নির্ধারণ করা হয়েছে দাসমুক্তির জন্য।[১]

দুই. কাফফারা : বিভিন্ন গুনাহ বা ভুলের কাফফারা নির্ধারণ করা হয়েছে দাস-মুক্তকরণকে।[২]

তিন. লিখিত চুক্তি : ইসলাম দাস-দাসীদের অনুমতি প্রদান করেছে তাদের মালিকের সাথে মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করার ।

> *তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি করো যদি জানো যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে অর্থ-কড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদের দান করো।*[৩]

চার. ক্ষতিপূরণ : কোনো দাস/দাসীকে চপেটাঘাত করা হলে, তার শাস্তি হিসেবে উক্ত দাস/দাসীকে মুক্ত করে দিতে হবে।[৪][৫]

পাঁচ. দাসমুক্তকরণে উৎসাহ প্রদান :

» দাসমুক্তিকে এক বিরাট সাওয়াবের কাজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[৬]

---

[১] দ্রষ্টব্য—সুরা তাওবা, আয়াত : ৬০

[২] দ্রষ্টব্য—সুরা মায়িদা, আয়াত : ৮৯; সুরা মুজাদালাহ, আয়াত : ৩; সুরা নিসা, আয়াত : ৯২

[৩] দ্রষ্টব্য—সুরা নুর, আয়াত : ৩৩

[৪] দ্রষ্টব্য : হাদিস-৬

[৫] দাস-দাসীদের কাউকে চপেটাঘাত করলে কাফফারা হিসেবে তাকে মুক্ত করে দেওয়াটা আবশ্যক কিছু নয়। তবে তাদের মনে যেন আঘাত না লাগে, সেজন্য তাকে মুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশ কিংবা তার মতোই চপেটাঘাত করার সুযোগ দেওয়াটা মূলত তাযিরের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও অন্যভাবেও তাযির বা শাস্তিপ্রদান করা যায়। [*শারহু মুসলিম*, নববি, খণ্ড : ১১; পৃষ্ঠা : ১২৮]—শারয়ি নিরীক্ষক

[৬] দ্রষ্টব্য : আয়াত-২

Scanned by CamScanner

» বিভিন্ন প্রাকৃতিক নির্দশনের সময় দাসমুক্তির নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যেমন—চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণকালে।[১]

» মুক্তিকামী দাস-দাসীদের অর্থকড়ি প্রদান করে সাহায্য করতে বলা হয়েছে।[২]

» মালিকের অধিক পছন্দনীয় এবং অধিক দামি দাস-দাসীর মুক্তিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা স্বাভাবিকভাবে কম থাকে। তাই ঘোষণা করা হয়েছে, সর্বোত্তম দাসমুক্তি হচ্ছে সবচেয়ে দামি এবং মালিকের অধিক পছন্দনীয় দাসকে মুক্ত করা।[৩]

» দাস-দাসী নিজের সমান হয়ে যাবে এমন আশঙ্কায় যারা তাদের দান করা থেকে বিরত থাকে তাদের তিরস্কার করা হয়েছে।[৪]

» কোনো ক্রীতদাস যদি একাধিক মালিকের আয়ত্তাধীনে থাকে এবং কোনো একজন মালিক তার অংশ থেকে ওই দাসকে মুক্ত করে দেয়, তবে উক্ত মালিকের জন্য ওই ক্রীতদাসকে অপর অংশীদারদের পক্ষ থেকে মুক্ত করে দেওয়াকেও জরুরি করে দেওয়া হয়েছে। মালিক তাতে অসমর্থ হলে, উক্ত ক্রীতদাসকে মুক্তিলাভের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার নিমিত্তে কাজ করার অনুমতি দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৫]

» দাসীকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে মুক্ত করে বিবাহকারীকে দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী বলা হয়েছে।[৬]

ইসলামে দাস-দাসীর অধিকার ও মর্যাদা

এক. ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা : ইসলাম দাসদেরকে ভাইয়ের মর্যাদায় উন্নীত করেছে।[৭]

---

[১] দ্রষ্টব্য—*সহিহুল বুখারি* : ১০৫৪, ২৫১৯, ২৫২০

[২] দ্রষ্টব্য—সুরা নুর, আয়াত : ৩৩

[৩] দ্রষ্টব্য—*সহিহুল বুখারি* : ২৫১৮, *সহিহ মুসলিম* : ৮৪

[৪] দ্রষ্টব্য—সুরা নাহল, আয়াত : ৭১

[৫] দ্রষ্টব্য—*সহিহুল বুখারি* : ২৫০৪, *সহিহ মুসলিম* : ১৫০৩

[৬] দ্রষ্টব্য : হাদিস-৭

[৭] দ্রষ্টব্য : হাদিস-২

Scanned by CamScanner

দুই. নেতৃত্বের অধিকার : ইসলামে দাসও আমির হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তাকে মান্য করা সকলের জন্য জরুরি।[১][২]

তিন. অন্ন-বস্ত্রের সমানাধিকার :

» মনিব যা খাবে দাসকেও তা-ই খাওয়াতে হবে।[৩]

» মনিব যা পরবে দাসকেও তা-ই পরাতে হবে।[৪]

চার. কাজ-কর্মে সহানুভূতি লাভের অধিকার :

» দাসের ওপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোনো কাজের বোঝা চাপানো যাবে না।[৫]

» দাসের ওপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা দিতে হলে নিজেও তাতে সাহায্য করতে হবে।[৬]

পাঁচ. সম্মান লাভের অধিকার :

» দাস-দাসীদের 'আমার বান্দা/দাস' 'আমার বান্দি/দাসী' বলা যাবে না, বলতে হবে 'আমার বালক', 'আমার বালিকা'।[৭]

» দাস-দাসীদের চপেটাঘাত পর্যন্ত করা যাবে না। তাদেরকে চপেটাঘাত করা হলে মনিবকে এর শাস্তি পেতে হবে।[৮]

---

[১] দ্রষ্টব্য—*সহিহুল বুখারি* : ৭১৪২

[২] এখানে আমির বলতে কোনো দল বা ইসলামি ভূখণ্ডের আমির বোঝানো হয়েছে। কিন্তু সে পুরো ইসলামি খিলাফতের আমির তথা খলিফা হতে পারবে না। কেননা, শরিয়তের দৃষ্টিতে খলিফা হওয়ার জন্য স্বাধীন ব্যক্তি হওয়া শর্ত। *আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা, খণ্ড* : ৬; পৃষ্ঠা : ২১৯—শারয়ি নিরীক্ষক

[৩] দ্রষ্টব্য : হাদিস-২

[৪] দ্রষ্টব্য : হাদিস-২

[৫] দ্রষ্টব্য : হাদিস-২

[৬] দ্রষ্টব্য : হাদিস-২

[৭] দ্রষ্টব্য : হাদিস-৩

[৮] দ্রষ্টব্য : হাদিস-৬

Scanned by CamScanner

» দাস-দাসীর ওপর কোনো অপবাদ আরোপ করা যাবে না।[১]

ছয়. ধর্মীয় মর্যাদা : ইসলামে একজন দাসের ধর্মীয় মর্যাদা একজন স্বাধীন মুসলিমের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়; বরং এক দৃষ্টিকোণ থেকে বেশিই বলা যায়। কেননা, যদি কোনো দাস তার মালিকের প্রতি সৎ এবং বিশ্বস্ত থাকে এবং তার প্রভুর (আল্লাহর) ইবাদতও যথাযথভাবে করে, তবে সে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে।[২]

সাত. ন্যায়বিচার লাভের অধিকার : ইসলাম ক্রীতদাসের ন্যায়বিচার লাভের অধিকার নিশ্চিত করে। বিশ্বে যেখানে দাসদের ওপর চলছিল ইচ্ছেমতো অত্যাচার, নিপীড়ন; দাসদের হত্যা করাও যখন ছিল আইনসিদ্ধ, সেই সময় ইসলাম ঘোষণা করে কঠোরতম সতর্কবাণী। কেউ কোনো ক্রীতদাসকে হত্যা করলে তাকেও হত্যা করা হবে, কেউ কোনো ক্রীতদাসের অঙ্গহানি ঘটালে তারও অঙ্গহানি ঘটানো হবে।[৩]

আট. জৈবিক চাহিদা পূরণের অধিকার : ইসলাম দাস-দাসীর জৈবিক চাহিদা পূরণের অধিকার নিশ্চিত করেছে এবং নিজের দাস-দাসীর বিবাহ দিয়ে দেওয়াকে মনিবের জন্য দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারণ করেছে।[৪]

নয়. পবিত্র জীবন-যাপনের অধিকার : ইসলামে দাসীদের পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে—

তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে, তোমরা পার্থিব সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য কোরো না।[৫]

দশ. বিবাহের ক্ষেত্রে মতামত প্রদানের অধিকার : কোনো মনিব তার ক্রীতদাসীর সাথে আলোচনা না করে তাকে কারো সাথে বিয়ে দিতে পারবে না।[৬]

---

[১] দ্রষ্টব্য : হাদিস-৫

[২] দ্রষ্টব্য—*সহিহুল বুখারি* : ৯৭

[৩] দ্রষ্টব্য : হাদিস-৪

[৪] সুরা নুর, আয়াত : ৩২

[৫] সুরা নুর, আয়াত : ৩৩

[৬] *সহিহুল বুখারি* : ৬৯৭০

Scanned by CamScanner

এগারো. ক্রীতদাসী এবং তার শিশুর একত্র থাকার অধিকার : কোনো ক্রীতদাসীকে ভিন্ন কোথাও বিক্রি করে, তার থেকে তার শিশুকে বিচ্ছিন্ন করার অনুমতি ইসলামে নেই। এবং এই ধরনের বেচা-কেনা একেবারেই নিষিদ্ধ।[১]

শেষ কথা

এতক্ষণ আমরা দেখলাম, প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ইসলামে দাস-দাসীদের অবস্থান কোথায় ছিল। এবার মাত্র কয়েক শতক আগে পাশ্চাত্যের Slave code-এ দাস-দাসীদের আইনসিদ্ধ অবস্থান কোথায় ছিল তার কিছু নমুনা দেখা যাক—

Virginia, 1705 – 'If any slave resists his master...correcting such a slave, and shall happen to be killed in such correction...the master shall be free of all punishment...as if such accident never happened.'

Alabama, 1833, section 31 – 'Any person or persons who attempt to teach any free person of color, or slave, to spell, read, or write, shall, upon conviction thereof by indictment, be fined in a sum not less than two hundred and fifty dollars, nor more than five hundred dollars.'

Alabama, 1833, section 32 – 'Any free person of color who shall write for any slave a pass or free paper, on conviction thereof, shall receive for every such offense, thirty-nine lashes on the bare back, and leave the state of Alabama within thirty days thereafter...'

Alabama, 1833, section 33 – 'Any slave who shall write for any other slave, any pass or free-paper, upon conviction, shall receive, on his or her back, one hundred lashes for the first offence, and seven hundred lashes for every offence thereafter...'

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৯৬

Scanned by CamScanner

South Carolina, 1712–No slave shall be allowed to work for pay, or to plant corn, peas or rice; or to keep hogs, cattle, or horses; or to own or operate a boat; to buy or sell; or to wear clothes finer than 'Negro cloth'[১]

অর্থাৎ দাসদের পড়াশোনা করার, মজুরি খাটার, কিছু উৎপাদন করার, গবাদি পশু রাখার, নৌকা রাখা/চালানোর, কেনা-বেচা করার, ভালো কাপড় পরিধান করার অধিকার কেবল হরণই করা হয়নি, মালিককে এই অধিকারও দেওয়া হয়েছিল যে, ক্রীতদাসকে সংশোধন করতে গিয়ে যদি সে তাকে মেরেও ফেলে, তবুও তার কোনো শাস্তি হবে না, যেন এটা কোনো ঘটনাই না!

এরপরেও, যদি কেউ দাসপ্রথার কথা এলেই ইসলামের দিকে আঙুল তোলেন, তবে বলতেই হবে, যারা চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর ভান করেন, তাদের জাগানোর সাধ্য কারো নেই।

[১] তথ্য সূত্র : http : //en.wikipedia.org/wiki/Slave_codes

Scanned by CamScanner

উৎসর্গের উৎসবে

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

প্রতিবছর ঈদুল আযহার সময় এলেই ইসলামবিরোধীদের থেকে একটি যুক্তি শোনা যায়। যুক্তিটা হলো—'পশু হত্যা করে খাওয়ায় কোনো সমস্যা নেই; কিন্তু পশু হত্যা করে ধর্মীয় উৎসব করা অনৈতিক।'

এই যুক্তির মধ্যে কিছু সমস্যা রয়েছে। দেখা যাক, কী কী সমস্যা—

প্রথমত

খাওয়ার জন্য পশুহত্যা যদি অনৈতিক না হয়, তাহলে বোঝা যাচ্ছে পশুহত্যা কখনোই অনৈতিক নয়। তাদের যুক্তি থেকেই এটা বোঝা গেল।

দ্বিতীয়ত

পশুহত্যার সাথে খাওয়ার ব্যাপার যুক্ত থাকলে তা যদি অনৈতিক না হয় (তাদের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী), তবে মুসলিমদের ঈদুল আযহার কুরবানি মোটেও অনৈতিক হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে সুরা হজ-এ কুরবানি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

Scanned by CamScanner

.....

আর মানুষের মাঝে হজের ঘোষণা প্রচার করো। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে দূরদূরান্ত থেকে। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানসমূহে পৌঁছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ প্রদত্ত চতুষ্পদ জন্তু জবেহ করার সময় তাঁর নাম স্মরণ করে। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার করো এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।

.....

.....

এরপর তারা যেন দৈহিক ময়লা দূর করে, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং এই সুসংরক্ষিত গৃহের তাওয়াফ করে।

.....

.....

এটাই বিধান। আর কেউ আল্লাহর সম্মানযোগ্য বিধানাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পালনকর্তার নিকট তা তার জন্যে উত্তম। উল্লিখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তির অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো এবং মিথ্যাকথন থেকে দূরে থাকো।[১]

.....

অর্থাৎ কুরআনে স্পষ্ট করেই বলা হচ্ছে, কুরবানির পশু থেকে নিজেরা আহার করবে এবং দরিদ্রদের আহার করাবে। আল্লাহ যেহেতু কুরবানির পশু হালাল করেছেন, মুসলিমরা এই হালাল মাংস ভক্ষণ করে। শুধু নিজেরাই যে ভক্ষণ করে তা নয়, বরং দুখী-দরিদ্রদেরও তা থেকে দান করে। কুরআনের আয়াত থেকেই এটা স্পষ্ট। এমন তো নয় যে, কুরবানির সময়ে মুসলিমরা শুধু 'পশুহত্যা' করেই উৎসব করে। মুসলিমরা শুধু 'পশুহত্যা করে আনন্দ করে' এর মাংস ফেলে দিচ্ছে না। মুসলিমরা নিজেরা এই হালাল মাংস খায় এবং দরিদ্রদের দান করে।[২]

---

[১] সুরা হজ, আয়াত : ২৭-৩০

[২] তবে এর মানে কিন্তু এটাও নয় যে, কুরবানির উদ্দেশ্য কেবল মাংস খাওয়া। কেউ শুধু মাংস খাওয়ার জন্য কুরবানি দিলে তার কুরবানি হবে না। কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে—'আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।'—সুরা আনআম, আয়াত : ১৬২

'এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করো এ কারণে যে, তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।'—সুরা হজ, আয়াত : ৩৭

Scanned by CamScanner

ঈদের আনন্দ এভাবেই পূর্ণতা পায়। ঠিক যেমনি ঈদুল ফিতরের জরুরি অনুষঙ্গ হচ্ছে ঈদের সালাতের আগেই ফিতরা হিসেবে দরিদ্রদের খাবার দেওয়া, যাতে ঈদের দিন কেউ অভুক্ত না থাকে। ঈদুল আযহাতেও মুসলিমরা পশু কুরবানি করে 'রক্তের হোলিখেলায়' মেতে ওঠে না, বরং নিজেরা দরিদ্রদের এই মাংস দান করে। মুসলিমদের দুটি ঈদের সাথেই এভাবে অভাবীদের কল্যাণ জড়িয়ে আছে। মুসলিমদের আনন্দের ধরনটাই এমন। মদ খেয়ে, পার্টি করে, হই-হুল্লোড় করে আনন্দ করা ইসলামের নীতি নয়। ইসলামের আনন্দ হলো পবিত্র আনন্দ। মুসলিমরা সালাত আদায় করে, আল্লাহর প্রশংসা করে, দরিদ্রদের সাহায্য করে ঈদের দিনে আনন্দ করে। পৃথিবীর আর কোন ধর্মগ্রন্থে এভাবে নিজেদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে দরিদ্রদের সহায়তা করতে বলা হয়েছে?

অথচ, ঈদুল আযহার এই দিকগুলোকে উল্লেখ না করেই ইসলামের শত্রুরা ক্রমাগত বলতে থাকে, 'মুসলিমরা রক্তারক্তি করে ঈদুল আযহায় উৎসব করে।' বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে একই দিনে অনেক পশু জবাই করা হলে রাস্তা তো রক্তে লাল হবেই। যেহেতু এখানে নির্দিষ্ট স্থানে কুরবানির ব্যবস্থা নেই। রক্ত ঝরিয়ে রাস্তা লাল করা বা নোংরা করা তো ঈদুল আযহা বা কুরবানির উদ্দেশ্য নয়।[১] সুনির্দিষ্ট স্থানে, পরিচ্ছন্ন উপায়ে কুরবানি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে এবং রাস্তাঘাট নোংরা না করে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারলে নিঃসন্দেহে তা উত্তম।[২] কিন্তু নাস্তিক-

---

এখানে মাংসের বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ হলো কুরবানির মাংসকে আল্লাহ হালাল করেছেন বিধায় মুসলিমরা তা খায়। পবিত্র কুরআনেই এই মাংস খাওয়া এবং দরিদ্রদের দান করার কথা উল্লেখ রয়েছে। নিজেরা খাওয়া এবং দরিদ্রদের দান করার মাধ্যমে ঈদুল আযহার আনন্দ পূর্ণতা পায়। অথচ নাস্তিক-মুক্তমনাদের নিজস্ব যুক্তিতেই যেখানে পশুহত্যা করে ভক্ষণ করা অনৈতিক নয়, সেখানে তাদের যুক্তিতেই ঈদুল আযহা বর্বর হতে পারে না।

[১] 'এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের মনের তাকওয়া। এভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করো এ কারণে যে, তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।'—সুরা হজ, আয়াত : ৩৭

[২] আবু মালিক আল-হারিস ইবনু আসিম আল-আশআরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক; ...। তথ্যসূত্র—*সহিহ মুসলিম* : ২২৩

সালিহ ইবনু আবি হাসসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি সায়িদ ইবনুল মুসাইয়াব রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা পবিত্র এবং পবিত্রতা ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। তিনি মহান ও দয়ালু, মহত্ত্ব ও দয়া ভালোবাসেন। তিনি দানশীল ও দানশীলতাকে ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরা (সবকিছু) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো। আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, তোমাদের আশপাশের পরিবেশ (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো) এবং ইহুদিদের অনুকরণ করো না। আমির ইবনু সাদ তার পিতার সূত্রে

Scanned by CamScanner

মুক্তমনাদের দেখা যায়—ঈদুল আযহার রক্তাক্ত রাস্তার ছবি পোস্ট করে এর নামে বিষোদগার করতে।

তাদের একটা জিনিস মনে করিয়ে দিতে চাই, খাবার জন্য পশু জবাই করা হলে তাতেও কিন্তু রক্ত ঝরে। জানেন কি? প্রতিদিন কসাইখানায় মাংস উৎপাদনের জন্য যে পশুগুলো হত্যা করা হয়, সেগুলো মোটেও রক্তপাতবিহীন নয়! ব্যাপার হচ্ছে ওই রক্ত আপনাদের চোখের সামনে আসে না, ঈদুল আযহার দিনেরটাই শুধু আসে। চোখের সামনে না আসা মানেই কিন্তু এই নয় যে, এর অস্তিত্ব নেই। এরপরও যদি মুসলিমদের ঈদকে 'রক্তারক্তির উৎসব' বলতে চান তাহলে আমরা বলব—'আপনাদের খাদ্যাভ্যাসও রক্তাক্ত খাদ্যাভ্যাস!'

নাস্তিক-মুক্তমনাদের মধ্যে যারা খাওয়ার জন্য পশুহত্যাকে নৈতিক মনে করেন, তাদের কারো থেকে ঈদুল আযহাকে অনৈতিক বলা মোটেও যৌক্তিক নয়। আপনি যদি ভিগান কিংবা ভেজিটারিয়ান না হন[১], তাহলে ঈদুল আযহাকে বর্বর বলা আপনার জন্য একটি দ্বিমুখী নীতি। বর্তমান সময়ে ঈদুল আযহাকে বর্বর বলা নাস্তিক-মুক্তমনাদের বড় একটি অংশই ভিগান নন, ভেজিটারিয়ানও নন। তারা সারা বছর মাংস ভক্ষণ করে; কিন্তু ঈদুল আযহা এলেই ভুল যুক্তি দিয়ে একে বর্বর বলে।

পশু হত্যার সাথে যদি খাদ্যের ব্যাপার জড়িত থাকে, তাহলে নাস্তিক-মুক্তমনাদের নৈতিকতার মানদণ্ড অনুযায়ী সেটা অনৈতিক কিছু নয়; কিন্তু, ঈদুল আযহা এলেই তারা একে বর্বর, অনৈতিক ইত্যাদি বলে তাদের ব্লগ এবং ফেইসবুক লাইভ সরগরম করে রাখে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একই রকম হাদিস আমার কাছে বলেছেন। তবে তিনি তাতে বলেছেন, তোমরা তোমাদের আশপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখো। তথ্যসূত্র—*জামি তিরমিযি* : ২৭৯৯

আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রতিদিন সকালে আদম-সন্তানের দেহের প্রতিটি জোড়ার জন্য সাদাকা ধার্য করা হয়। তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারীদের তার সালাম দেওয়া একটি সাদাকা। সৎকাজের আদেশ করা একটি সাদাকা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাও একটি সাদাকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা একটি সাদাকা। তথ্যসূত্র—*সুনানু আবি দাউদ* : ৫২৪৩

[১] Vegan এবং Vegetarian-রা পশু হত্যা করে খাওয়াকেও অনৈতিক মনে করে। তবে তাদের এই নৈতিকতার স্ট্যান্ডার্ডের সাথে আমরা ভিন্নমত পোষণ করছি। মুসলিমদের নৈতিকতার উৎস হলো কুরআন এবং সুন্নাহ।

Scanned by CamScanner

ঈদুল আযহার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বকেও কোনো যুক্তিনিষ্ঠ মানুষের পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর বহু জায়গায় মাংস এক প্রকারের আকাঙ্ক্ষিত এবং উন্নত খাদ্য হিসেবে সুবিদিত। মুসলিম দেশগুলোতে বহু দরিদ্র মানুষ সারা বছর ধরে ঈদুল আযহার প্রতীক্ষায় থাকে। কারণ, এই সময়টাতে তারা মাংস খেতে পারবে। এখানে কুরবানির পশুর সাথে জড়িত বিপুল পরিমাণ মানুষের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক নানা গুরুত্বপূর্ণ দিকও জড়িয়ে আছে।[১] পশু জবাই তো ঈদুল আযহার একমাত্র কাজ নয়; বরং অনেকগুলো কাজের মধ্যে একটি কাজ। ইসলামবিরোধীরা ঈদুল আযহাকে 'রক্তপাতের উৎসব' বলে প্রচার করে, ঈদুল আযহাকে আংশিকভাবে তুলে ধরে; কিন্তু এর অন্য অনুষঙ্গাগুলো এড়িয়ে যায়। এভাবে আংশিকভাবে একটা বিষয়কে চিত্রিত করে অনেক সাধারণ জিনিসকেও খুব সহজে ভয়ংকর এবং বর্বর হিসেবে তুলে ধরা যায়।

তাদের ভুল যুক্তি বা দ্বিমুখী নীতিটি কি বোঝা যাচ্ছে? তাদের এই আংশিক প্রচারণার দিকটি কি স্পষ্ট হচ্ছে?

[১] 'ঈদ বাণিজ্যে দেশের অর্থনীতিতে যোগ হবে দেড় লাখ কোটি টাকা'—ভোরের কাগজ, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ [http : //www.bhorerkagoj.com/print edition/2016/09/12/106771.php]

'কুরবানির চামড়ার অর্থায়নে দারিদ্র্য বিমোচন ভাবনা _ মতামত' - দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ জুলাই, ২০২০ https : //www.ittefaq.com.bd/opinion/171230/কুরবানির-চামড়ার-অর্থায়নে-দারিদ্র্য-বিমোচন-ভাবনা

Scanned by CamScanner

আবু লাহাবের ব্যাপারে অভিশাপপূর্ণ বাণী প্রসঙ্গ

নাফিস শাহরিয়ার

নাস্তিকদের প্রশ্ন : কুরআনে 'আবু লাহাব' নামক ব্যক্তির ব্যাপারে অভিশাপপূর্ণ বাণী রয়েছে। একজন সৃষ্টিকর্তার জন্য এটি কি হাস্যকর নয়? (আস্তাগফিরুল্লাহ)

উত্তর : অমুসলিম এবং নাস্তিকদের করা প্রশ্নগুলোর মধ্যে এটাও বেশ বিখ্যাত। কুরআন যদি সৃষ্টিকর্তার বাণী হয়ে থাকে, যদি এটি মানবজাতির জন্য পথনির্দেশক হয়, তাহলে কী করে এতে কেবল একজন মানুষকে উদ্দেশ্য করে সম্পূর্ণ একটি সুরা নাযিল হয়? এটি বোঝার জন্য তৎকালীন আরবের সামাজিক অবস্থা এবং আবু লাহাবের ভূমিকা পর্যালোচনা করা খুবই জরুরি।

এক.

তৎকালীন সেই অরাজকতা, বিশৃঙ্খলার সময়েও আরবের লোকেরা কিছু নির্দিষ্ট নীতি কঠোরভাবে মেনে চলত। আরব-সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি। যত যা-ই হোক না কেন নিজ বংশের কাউকে কোনোমতেই শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া যাবে না—এটাই ছিল তাদের নীতি। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে মহাপাপ বলে মনে করত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে এলেন, তখন কুরাইশ গোত্রের অন্যান্য পরিবার ও তাদের সর্দাররা তার কঠোর বিরোধিতা করলেও, আরবের এ প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রভাবে বনু হাশিম ও বনু

Scanned by CamScanner

মুত্তালিব তার বিরোধিতা করেনি। তাদের অধিকাংশই তার নবুওয়াতের প্রতি ঈমান না এনেও তাকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়ে এসেছেন।

জাহিলি যুগের আরবরাও এই নৈতিক আদর্শকে সমান মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখত। তবে কেবল একজন ব্যক্তি, ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ এবং শত্রুতায় অন্ধ হয়ে এই মূলনীতি লঙ্ঘন করে। আর সে হলো—আবু লাহাব, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। আসল নাম আব্দুল উজ্জা।

প্রাথমিক অবস্থায় ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হতো গোপনে। এরপর যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হলো—

আর আপনি আপনার গোত্রের নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক করুন।[১]

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পর্বতে উঠে সকলকে ডাক দিয়ে একত্র করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি যদি বলি, একটি শত্রুদল ক্রমশই এগিয়ে আসছে এবং সকাল-বিকাল যেকোনো সময় তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? সবাই এক বাক্যে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই করব।' তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি (শিরক ও কুফরের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভীষণ আযাব সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছি।'

একথা শুনে আবু লাহাব বলল, 'ধ্বংস হও তুমি! এজন্যই কি আমাদের একত্র করেছ?' একথা বলে সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাথর মারতে উদ্যত হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুরা লাহাব অবতীর্ণ হয়।[২]

ইবনু যায়িদ থেকে বর্ণিত এক হাদিসে বলা হয়েছে, আবু লাহাব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একদিন জিজ্ঞেস করল, 'যদি আমি তোমার দ্বীন গ্রহণ করি, তাহলে আমি এর বদলে কী পাব?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, অন্যান্য ঈমানদাররা যা পাবেন, আপনিও তাই পাবেন।'

---

[১] সুরা শুআরা, আয়াত : ২১৪

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৪৯৭১, ৪৯৭২; *সহিহ মুসলিম* : ২০৮, *জামি তিরমিযি* : ৩৩৬৩

Scanned by CamScanner

আবু লাহাব বলল, 'আমার জন্য বাড়তি কোনো মর্যাদা নেই?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, '(এছাড়া) আপনি আর কী চান?' আবু লাহাবের উত্তর ছিল, 'সর্বনাশ হোক এমন দ্বীনের, যেখানে আমি ও অন্যান্য লোকেরা একই পর্যায়ভুক্ত হব!'[১]

মক্কায় আবু লাহাব ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটতম প্রতিবেশী। এছাড়াও হাকাম ইবনুল আস, উকবা ইবনু আবি মুয়িত, আদি ইবনু হামরা এবং ইবনুল আসদা হুযালিও তার প্রতিবেশী ছিল। এরা কেউই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক মুহূর্তের জন্যেও স্বস্তি দিত না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন তারা তার গায়ের ওপর ছাগলের নাড়িভুঁড়ি নিক্ষেপ করত, যখন রান্না হতো তখন হাড়ির ওপর ময়লা ছুড়ে মারত। এছাড়া আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মু জামিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরজার সামনে কাঁটাগাছের ডালপালা ছড়িয়ে রেখে যেত, যাতে রাসুল ও তার সন্তানেরা আহত হন। এগুলো ছিল নিত্যনৈমিত্তিক আচরণ।[২]

নবুওয়াতলাভের পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দুই মেয়ে, রুকাইয়া এবং উম্মু কুলসুমকে আবু লাহাবের দুই পুত্র উতবা এবং উতাইবার সাথে বিয়ে দেন। নবুওয়াতের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন, তখন আবু লাহাব তার পুত্রদের বাধ্য করে রাসুলের কন্যাদের তালাক দিতে। সে বলে—'তোমরা মুহাম্মাদের মেয়েদের তালাক না দিলে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হারাম হয়ে যাবে।'[৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম পুত্র কাসিমের মৃত্যুর কিছুদিন পর, তার দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহরও মৃত্যু হয়। এ খবরে আবু লাহাব ভাতিজাকে সঙ্গা দেওয়া তো দূরে থাক, সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে দৌড়ে কুরাইশ সর্দারদের কাছে গিয়ে বলে, 'শোনো, আজ মুহাম্মাদের নাম-নিশানা মিটে গেছে!'

---

[১] *তাফসিরুত তাবারি,* খণ্ড : ২৪; পৃষ্ঠা : ৬৭৫

[২] *আস-সুনানুল কুবরা,* বাইহাকি : ১৭৭২৮, ১৭৭২৯, *তাফসিরু ইবনি আবি হাতিম,* খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ৩৪৭৩, *তাফসিরুত তাবারি,* খণ্ড : ২৪; পৃষ্ঠা : ৬৭৮, *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৩৫৫, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া,* খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ১৬৫

[৩] *উসদুল গাবাহ,* খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ৩৭৪

Scanned by CamScanner

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানেই ইসলামের দাওয়াত দিতে যেতেন, আবু লাহাব সেখানেই তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত। রবিআ ইবনু আব্বাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাহিলিয়াতের যুগে জুল-মাজায বাজারে দেখলাম, তিনি বলছিলেন, 'হে মানব-সম্প্রদায়, তোমরা ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' বলো, তোমরা সফলকাম হবে।' আর মানুষ তার চারপাশে ভিড় জমাচ্ছিল। ওদিকে পেছন থেকে গৌর বর্ণের ট্যারা চোখওয়ালা সুন্দর চেহারার এক লোক তাকে পাথর মেরে চলেছে আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোড়ালি রক্তে ভিজে যাচ্ছিল আর সেই লোক বলছিল, 'এ লোকটি ধর্মত্যাগী, মিথ্যাবাদী।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানেই যেতেন, লোকটি তার পেছন পেছন সেখানেই যেত। তারপর, এ লোকটি সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম। লোকেরা বলল, এ লোক তারই চাচা আবু লাহাব।'[১]

নবুওয়াতের সপ্তম বছরে কুরাইশদের সমস্ত পরিবার মিলে বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিব পরিবারকে সামাজিকভাবে ও অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করে। এ সময় এক আবু লাহাবই নিজের পরিবার ও বংশকে কোনো প্রকার সমর্থন দেওয়া তো দূরে থাক, উল্টো কাফিরদের সাথে জোট বেঁধে সব থেকে আক্রমণাত্মক আচরণ করেছিল। মক্কার বাইরে থেকে কোনো বাণিজ্য কাফেলা এলে আবু তালিবদের কেউ তাদের কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য কিনতে গেলে আবু লাহাব চিৎকার করে বলত, 'ওদের কাছ থেকে এত বেশি দাম চাও, যাতে ওরা কিনতে না পারে। এজন্য তোমাদের যত ক্ষতি হয়, আমি দেবো।' তখন তারা বিরাট দাম হাঁকাত। এ বয়কট ৩ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবকে বহুবার অনাহারে থাকতে হয়েছে।[২]

দুই.

ধরুন, আপনি একজন সুপার হিউম্যান। একদিন আপনি কারো সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, 'শীঘ্রই শাকিল সাহেব ধ্বংস হয়ে যাবেন। তার ধনসম্পদ, সন্তান কোনো

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬০২২

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৩৫০-৩৫৩, *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ২৭-২৮

Scanned by CamScanner

কিছুই কাজে আসবে না। তার মৃত্যু হবে খুবই করুণভাবে।' এখন শাকিল সাহেব যদি ধ্বংস না হয় এবং সুন্দরভাবে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে কিন্তু আপনার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়ে যায়। আপনার ওপর মানুষের যে আস্থা ছিল সব কিছুই এক মুহূর্তে তখন শেষ হয়ে যাবে। মানুষ তখন আর আপনার কথাকে বিশ্বাস করবে না, আপনাকে জানবে একজন ভণ্ড হিসেবে।

আমরা দুর্বল ঈমানের মুসলিমরা সুরা লাহাব নিয়ে অস্বস্তিতে থাকি। আর সেই একই সুরা তিলাওয়াত করে সাহাবিগণ তাদের ঈমান চাঙা করতেন। কারণ, এটা কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী সংশ্লিষ্ট একটি সুরা, যা নাযিল হয়েছিল আবু লাহাবের মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর আগে।

'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত।'[১], কিছু মুফাসসিরের মতে, এটা আসলে কোনো ধিক্কার নয়, এটা একপ্রকার ভবিষ্যদ্বাণী। এখানে ভবিষ্যতে যে ঘটনাটি ঘটবে তাকে অতীতকালের অর্থ প্রকাশক শব্দের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। যার অর্থ, আবু লাহাবের ধ্বংস হওয়া এতটাই নিশ্চিত, যেন তা হয়েই গেছে। আর হাত ভেঙে যাওয়ার অর্থ শরীরের অঙ্গ—'হাত' ভেঙে যাওয়া নয়; বরং কোনো ব্যক্তি যে উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্য সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে, তাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাওয়াকেই এখানে বোঝানো হয়েছে।[২] যার সত্যতা আমরা দেখি বদর যুদ্ধের পর।

আবু লাহাবের সামনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভণ্ড প্রমাণ করার খুব সহজ একটা রাস্তা ছিল। আর সেটা হলো তার মুসলিম হয়ে যাওয়া। কারণ, সে মুসলিম হয়ে গেলেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভণ্ড প্রমাণিত হয়ে যান; কিন্তু সে যে সেটা হবে না এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্য নবি—এটা তো আবু লাহাবের মৃত্যু আর সুরা লাহাবই প্রমাণ করে। এ সুরাটি নাযিল হওয়ার সাত-আট বছর পর বদর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধে কুরাইশদের অধিকাংশ বড় বড় সর্দারই নিহত হয়। মজার ব্যাপার হলো, আবু লাহাব কিন্তু এই যুদ্ধে অংশগ্রহণই করেনি! সে নিজে না গিয়ে তার পক্ষ থেকে আস ইবনু হিশামকে (আবু জাহলের ভাই) পাঠায়। তাকে এই কথা বলে সমঝোতা করা হয় যে, আস

---

[১] সুরা লাহাব, আয়াত : ১

[২] *তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ২০; পৃষ্ঠা : ২৩৫-২৩৬, *ফাতহুল কাদির*, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ৬২৭

Scanned by CamScanner

ইবনু হিশামের কাছে আবু লাহাব যে ৪০০০ দিরহাম পেত, সেটা এর মাধ্যমে পরিশোধ হয়ে যাবে। বোঝাই যাচ্ছে কী পরিমাণ অর্থলিপ্সু আর কাপুরুষ ছিল সে।

যুদ্ধের ফলাফল শোনার পর আবু লাহাবের দেহে ভয়ংকর রকম ফুসকুড়ি দেখা দেয়। রোগ সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। মৃত্যুর পর ৩ দিন পর্যন্ত তার ধারে-কাছেও কেউ ঘেঁষেনি। আবু লাহাবের শরীরে পচন ধরে যায়। ফলে এক সময় লোকেরা তার ছেলেদের ধিক্কার দিতে থাকে। তখন তার ছেলেরা মজুরির বিনিময়ে লাশ দাফন করার জন্য কয়েকজন হাবশিকে নিয়োগ করে, যারা আবু লাহাবের লাশ মক্কার বাইরে দাফন করে আসে।[১]

যে ব্যক্তির ধৃষ্টতার কারণে এতবার নির্যাতিত হয়েছেন আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিচয় তুলে ধরার জন্য কুরআনে কেবলমাত্র একটি ছোট সুরা আছে, এতে এত অবাক হওয়ারই বা কী আছে!

অনেকে আরও একটি প্রশ্ন তোলে যে, কুরআনুল কারিম তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ। এই সুরায় কী উপদেশ রয়েছে?

উত্তরে আমরা বলি—

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শত্রুতা ও বিদ্রোহের পরিণতি যে কী হতে পারে, এই সুরা তো তারই সাক্ষ্য বহন করছে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুর ভয়ঙ্কর পরিণতির ব্যাপারে এখানে একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। কাজেই একজন বিবেকবান ব্যক্তির জন্য এই সুরা থেকে উপদেশ এই যে— আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কুফর ও বিরুদ্ধাচরণ করার পরিণতি অতি ভয়ংকর হয়ে থাকে।

---

[১] *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৪৬২

Scanned by CamScanner

স্রষ্টার প্রজ্ঞার অনন্য এক নিদর্শন—নাসখ

শিহাব আহমেদ তুহিন

যদি স্রষ্টা মানুষকে কিছু বলেন, তবে তাতে কি ভুল থাকা সম্ভব?

উত্তর হচ্ছে, না। সকল ধর্মের লোকেরাই এক্ষেত্রে একমত হবে। বিশেষত যারা দাবি করে, তাদের কাছে কিতাব আছে (মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়)। তারা তো সবার আগে মাথা ঝাঁকাবে।

এখন যদি বলা হয়, স্রষ্টা কি এমন বিধান দিতে পারেন, যা পরবর্তী সময়ে রহিত করতে হয়? এক্ষেত্রেও আহলে কিতাবরা বলবে, 'অসম্ভব, এটাও হতে পারে না।' অনেক মুসলিমও হয়তো অজ্ঞতার কারণে কিংবা মডারেট হয়ে বলবে—'এটা সম্ভব না।' যুক্তি হচ্ছে—

'কুরআন অনুসারে, আল্লাহ ভবিষ্যৎ জানেন। যদি কুরআনের রচয়িতা আল্লাহই হন, তবে কেন তিনি এমন বিধান দেবেন—যা পরবর্তী সময়ে রহিত করতে হয়? তিনি কি জানতেন না যে, তাঁর বিধান ভবিষ্যতে অকার্যকর হয়ে পড়বে?

যুক্তিটা সুন্দর। তবে যারা যুক্তিটা দেন তারা ইসলামে 'রহিতকরণ'—বলতে কী বোঝায় এবং এর পেছনে প্রজ্ঞাটা কী, তা ঠিকমতো বুঝতে পারেননি কিংবা বোঝার চেষ্টা করেননি।

Scanned by CamScanner

রহিতকরণ কী?

আরবি নাসখ (نسخ) শব্দের অর্থ রহিত করা। একদম সহজ করে বললে, নাসখ বলতে স্রষ্টার একটি বিধান নতুন আরেকটি বিধান দ্বারা বাতিল বা পরিবর্তিত হয়ে যাওয়াকে বোঝায়।

কেউ কেউ নাসখের ধারণা বোঝাতে নাকল (نقل) বা স্থানান্তর শব্দটা ব্যবহার করেছেন। শাইখ আব্দুর রহমান আস সাদি রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসিরে লিখেছেন—

'নাসখ বলতে আসলে স্থানান্তর বোঝায়। অর্থাৎ, (শরিয়ার) কোনো হুকুম অন্য হুকুম দ্বারা স্থানান্তর করা বা সরিয়ে ফেলা কিংবা পুরো হুকুমটাই সরিয়ে ফেলা।'[১]

রহিতকরণ কি সত্যিই আছে?

কুরআন-সুন্নাহ ও আমাদের সালাফদের থেকে রহিতকরণ বা 'নাসখ'-এর বিষয়টি পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত। আর এটা আমাদের অনেকের কমনসেন্সের সাথে না মিললেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই রহিতকরণের পেছনে প্রজ্ঞাটা ধরতে পারা যায়।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলেন—

> *আমি কোনো আয়াত রহিত করলে অথবা ভুলিয়ে দিলে তার চেয়ে উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। আপনি কি জানেন না, আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান?*[২]

এছাড়া হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, সুরা আহযাব এক সময় আকারে সুরা বাকারার মতো ছিল। পরবর্তী সময়ে এর অধিকাংশ আয়াত রহিত করে দেওয়া হয়। জির ইবনু হুবাইশ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উবাই ইবনু কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা সুরা আহযাবের কয়টি আয়াত পাঠ করো?' আমি বললাম, 'তিহাত্তরটি।' তিনি তখন বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা

---

[১] *তাফসিরুস সাদি*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৬১

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ১০৬

Scanned by CamScanner

যখন সুরা আহযাব পড়তাম, তখন তা সুরা বাকারার মতো বড় ছিল।'[১]

সাহাবিগণের কাছে 'রহিতকরণ'-এর জ্ঞান থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, অনেক সময়ে কেউ কেউ হালাল ভেবে নিজে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে, আর অন্যকেও সেদিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে। একবার চতুর্থ খলিফা আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন বিচারককে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি মানসুখ (রহিত) আইন-কানুন সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন কি না। বিচারক জবাব দিলেন, 'না।' আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, 'তুমি নিজে ধ্বংস হয়েছ আর অন্যদেরও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছ।'[২]

আমাদের সালাফরাও নাসখ নিয়ে প্রচুর বই লিখে গেছেন। সম্ভবত এর মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন গ্রন্থটি হলো বিখ্যাত তাবিয়ি, হাদিস বিশেষজ্ঞ কাতাদা ইবনু দিআমার লেখা *আন-নাসিখ ওয়াল-মানসুখ ফি কিতাবিল্লাহ*। এছাড়া নাসখ নিয়ে বই লিখেছেন ইবনু হাযম যাহিরি, মাক্কি ইবনু আবি তালিব, ইবনুল জাওযি প্রমুখ।

উল্লেখ্য, বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নাসখ-সংক্রান্ত ঘটনার সংখ্যা অল্প কয়েকটি। আর সেগুলো সনাক্ত করার সুনির্দিষ্ট তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলো হলো—

» রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা তার কোনো সাহাবির সুস্পষ্ট বক্তব্য।

» রহিতকারী ও রহিত—উভয়ের আইনের ব্যাপারে প্রথম দিকের মুসলিম বিশেষজ্ঞদের ইজমা বা ঐকমত্য থাকা।

» এ বিষয়ের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক জ্ঞান। অর্থাৎ, যে আইনটিকে রহিত করা হয়েছে সেটি রহিতকারী আইনটির পূর্বে নাযিল হয়েছে এবং তা রহিতকারী আইনটির কোনো সম্পূরক বিধি নয়, বরং তার সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক।

---

[১] *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৪৪২৮, ৪৪২৯

ইবনু হাযম রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, 'এ হাদিসের সনদ সূর্যের মতো সহিহ (صَحِيحٌ كَالشَّمْسِ)।'—*আল-মুহাল্লা*, ১২; পৃষ্ঠা : ১৭৫

[২] *আল-ইতকান*, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৫৯

Scanned by CamScanner

নাসখ কত প্রকারের হতে পারে?

মূলত তিন ধরনের নাসখ সংঘটিত হতে পারে।[১]

এক. কুরআন দ্বারা কুরআনের নাসখ : এ ক্ষেত্রে কুরআনের পূর্ববর্তী একটি আইন পরবর্তী আইন দ্বারা রহিত হয়। যেমন, যেসব নারীরা ব্যভিচার করে, তাদের শাস্তি সম্পর্কে কুরআনে নাযিল করা হয়—

'আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে এসো। আর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখো, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদের তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো পথ নির্দেশ না করেন।'[২]

এ আইনটি পরবর্তী সময়ে বাতিল করা হয়। যারা এ ধরনের মন্দ কাজ করবে তাদের শাস্তি সম্পর্কে নাযিল করা হয়—

'ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করার কারণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়—যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। মুসলিমদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।'[৩]

দুই. কুরআনের মাধ্যমে সুন্নাহর নাসখ : এক্ষেত্রে, নবিজির একটি নির্দেশ কিংবা তিনি পালন করতেন এমন কোনো সুন্নাহ পবিত্র কুরআনের কোনো আয়াত দ্বারা

---

[১] নাসখ মূলত চার প্রকার। তন্মধ্যে তিনটি ঐকমত্য-সমর্থিত, আর একটি মতানৈক্যপূর্ণ। সুতরাং কুরআন দ্বারা কুরআনের নাসখ, কুরআন দ্বারা সুন্নাহর নাসখ এবং সুন্নাহ দ্বারা সুন্নাহর নাসখ নিয়ে কোনো মতভেদ নেই; কিন্তু সুন্নাহর দ্বারা কুরআনের নাসখ নিয়ে বড় মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ ও অধিকাংশ উসুলবিদদের মতে, মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা কুরআনের নাসখ বৈধ। আর ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ ও অধিকাংশ জাহিরিদের মতে মুতাওয়াতির হোক বা আহাদ হোক কোনো প্রকারের হাদিস দ্বারাই কুরআনের নাসখ বৈধ নয়। আর ইমাম ইবনু হাজাম রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে মুতাওয়াতির হোক বা আহাদ হোক বিশুদ্ধ হলে সব প্রকারের হাদিস দ্বারাই কুরআনের নাসখ বৈধ। দেখেন—*আর-রিসালা* : ১০৬-১০৯, *ইরশাদুল ফুহুল,* খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৭০, *আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম,* খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৫০৫, *মানাহিলুল ইরফান,* খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ২৪১—শারয়ি নিরীক্ষক

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ১৫

[৩] সুরা নুর, আয়াত : ২

Scanned by CamScanner

রহিত হয়ে যায়। 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় এলেন, তখন দেখলেন ইহুদিরা আশুরার দিন রোজা রাখে। তখন তিনি বললেন, 'কেন তোমরা এ দিনে রোজা রাখো?' তারা বলল, 'এটি উত্তম দিন। এ দিনে আল্লাহ বনি ইসরাইলকে তাদের শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করেছেন; তাই মুসা আলাইহিস সালাম এ দিনে রোজা রাখতেন।' তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমাদের চেয়ে আমি মুসার অধিক নিকটবর্তী। তাই তিনি এ দিন রোজা রাখলেন এবং অন্যদেরকেও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।'[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই নির্দেশের পর সবাই বাধ্যতামূলকভাবে আশুরার দিন সিয়াম পালন করত। তখনো রামাদানে সিয়াম রাখার বিধান নাযিল হয়নি। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন—

'রামাদানই হলো সে মাস, যে মাসে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য-বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোজা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে।'[২]

ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী, এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর মুসলিমরা আশুরার সিয়ামকে বাধ্যতামূলক হিসেবে পালন করেনি; বরং তা ঐচ্ছিক হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার দিন সিয়াম পালন করতেন এবং আমাদেরকেও পালন করতে নির্দেশ দিতেন। তারপর যখন রমাদানের সিয়াম ফরজ করা হলো, তখন আশুরার সিয়াম ছেড়ে দেওয়া হলো।'[৩]

তিন. সুন্নাহর মাধ্যমে সুন্নাহর নাসখ : যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো নির্দেশ পরবর্তী সময়ে তার আরেকটি নির্দেশ দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। যেমন, ইসলামের প্রথম দিকে কেউ রান্না করা খাবার খেলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২০০৪

[২] সুরা বাকারা : ১৮৫

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ১৮৯২

Scanned by CamScanner

সাল্লাম তাকে সালাত আদায়ের পূর্বে অযু করার নির্দেশ দিতেন; কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা রহিত হয়ে যায়। জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (রান্না করা খাবার সম্পর্কিত) দু-রকম নির্দেশের শেষেরটিতে আগুনে রান্না করা বস্তু খাওয়ার পর অযু না ভাঙার কথা বলা হয়েছে।'[১] অর্থাৎ রান্না করা খাবার খেলে পুনরায় অযু করার প্রয়োজন নেই।

এছাড়াও নাসখ আরও বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। শুধু কুরআনের ক্ষেত্রেই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে নাসখ হতে পারে—

এক. নতুন আইন দ্বারা পূর্বের আইনটি বাতিল হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতের পাঠও কুরআন থেকে সরিয়ে ফেলা। এ ধরনের নাসখের ঘটনা বিরল। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন—

'ওহিসমূহের মধ্যে এ আইনটিও ছিল যে, কোনো ধাত্রী কোনো শিশুকে দশবার দুধ পান করালে ওই শিশুর সাথে ধাত্রী ও তার নিকটাত্মীয়দের বিয়ে হারাম হয়ে যায়, যেমনটি ঘটে থাকে আপন মায়ের নিকটাত্মীয়দের ক্ষেত্রে। তারপর এই আইনটির স্থান দখল করে পাঁচবার দুধ পান করানো-সংক্রান্ত আইন, যা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগেও কুরআনের অন্যান্য আয়াতের সাথে পঠিত হতো।'[২]

দুই. আইনটি বলবৎ থাকে, শুধু আয়াতের তিলাওয়াত রহিত হয়ে যায়। পূর্বে কুরআনে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ব্যভিচারীদের পাথর মেরে হত্যা করা-সংক্রান্ত আয়াত পঠিত হতো। উবাই ইবনু কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু সে আয়াতটি বর্ণনা করেছেন, 'বৃদ্ধ নারী ও পুরুষ ব্যভিচার করলে তাদেরকে নিশ্চিতরূপে পাথর মারবে।'[৩]

এ আয়াতটি এখন আর কুরআনে নেই। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশেই তা কুরআন থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে আইনটি কিন্তু রহিত হয়নি। খুলাফায়ে রাশিদিনের সকলেই এই আইনটি প্রয়োগ করেছেন।

---

[১] *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ১১৩৪

[২] *সহিহ মুসলিম* : ১৪৫২

[৩] *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৪৪২৯

Scanned by CamScanner

তিন. আয়াতের তিলাওয়াত বহাল থাকবে, কিন্তু আইন রহিত হয়ে যাবে। এই ধরনের নাসখের উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যেতে পারে নিম্নোক্ত আয়াতটি—

.....

আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে, তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে অসিয়ত করে যাবে। অতঃপর যদি সেই স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সেই নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোনো উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের ওপর কোনো পাপ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন।[১]

.....

এ আয়াতটি পরবর্তী সময়ে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়—

.....

আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদের ছেড়ে যাবে, তখন সেসব স্ত্রীর কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসংগত ব্যবস্থা নিলে কোনো পাপ নেই।[২]

.....

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক প্রকারের নাসখই স্বয়ং আল্লাহ তাআলার অনুমোদনেই হয়ে থাকে।

অনেকে নাসখ-মানসুখ অস্বীকার করতে গিয়ে এই আয়াতটি উদ্ধৃত করেন—

.....

তাঁর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তনকারী নেই।[৩]

.....

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'আল্লাহর বাণীসমূহ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। তবে (অন্য

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৪০

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৩০

সুরা বাকারার ২৪০ নং আয়াতটি ২৩০ নং আয়াত দ্বারা রহিত হতে দেখে অনেকে ভুল বুঝতে পারেন। ক্রমধারায় ২৪০ নং আয়াত পিছিয়ে তবে আয়াতটি ২৩০ নং আয়াতের পূর্বে নাযিল হয়েছিল।

[৩] সুরা কাহফ, আয়াত : ২৭

Scanned by CamScanner

কেউ না পারলেও) আল্লাহ নিজে এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত নাযিল করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন, তিনিই সে সম্পর্কে ভালো জানেন। যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি, তখন এরা বলে, 'তুমি নিজেই এ কুরআনের রচয়িতা; আসলে এদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না।'[১]

'আল্লাহর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তনকারী নেই' মানে আল্লাহ তাআলা যদি কারো জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করে থাকেন তবে কেউই তা পরিবর্তন করতে পারবে না। যদি আল্লাহ তাআলা কারো জন্য দরিদ্রতা নির্ধারণ করে থাকেন তবে কেউই তা পরিবর্তন করতে পারবে না। যদি আল্লাহ তাআলা কারো জন্য অনুর্বরতা নির্ধারণ করে থাকেন তবে কেউই তা পরিবর্তন করতে পারবে না।'[২]

নাসখ কেন করা হয়? এর পেছনে কি কোনো প্রজ্ঞা রয়েছে?

শাইখ রাহমাতুল্লাহ কিরানবি রাহিমাহুল্লাহ তার অনবদ্য বই *ইযহারুল হক*-এ নাসখের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন—

'আল্লাহ তাআলা জানতেন যে, এই বিধানটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত থাকবে এবং এরপর তা স্থগিত হয়ে যাবে। যখন তাঁর জানা সময়টি এসে গেল, তখন তিনি নতুন বিধান প্রেরণ করলেন। এই নতুন বিধানের মাধ্যমে তিনি পূর্বতন বিধানের আংশিক বা সামগ্রিক পরিবর্তন সাধন করতেন। প্রকৃতপক্ষে, এ হলো পূর্বতন বিধানের কার্যকারিতার সময়সীমা জানিয়ে দেওয়া। তবে যেহেতু আগের বিধানটি দেওয়ার সময় এর সময়সীমা উল্লেখ করা হয়নি, সেহেতু নতুন বিধানটির আগমনকে আমরা আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে বাহ্যত 'পরিবর্তন' বলে মনে করি।

আল্লাহর সাথে কোনো সৃষ্টির তুলনা হয় না। তাই তুলনার জন্য নয়, শুধু বোঝার জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। আপনি আপনার একজন কর্মচারীকে একটি

---

[১] সুরা নাহল, আয়াত : ১০১

[২] *মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসায়িল*, ইবনু উসাইমিন, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৩৭০

Scanned by CamScanner

কর্মের দায়িত্ব প্রদান করলেন। আপনি তার অবস্থা জানেন এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এক বছর পর্যন্ত সে উক্ত কর্মে নিয়োজিত থাকবে। এরপর আপনি তাকে অন্য কর্মে নিয়োগ করবেন; কিন্তু আপনার এই সিদ্ধান্ত আপনি কারো কাছে প্রকাশ করেননি। যখন নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেল, তখন আপনি আপনার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে তাকে অন্য কর্মে নিয়োজিত করলেন। এই বিষয়টি উক্ত কর্মচারীর নিকট 'রহিতকরণ' বলে গণ্য। অনুরূপ, অন্য সকল মানুষ যাদের নিকট আপনি আপনার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেননি, তারাও বিষয়টিকে 'পরিবর্তন' বলে গণ্য করবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এবং আপনার কাছে বিষয়টি 'পরিবর্তন' নয়।

এরূপ রহিতকরণ যুক্তি বা বিবেকের দৃষ্টিতে অসম্ভব না। আল্লাহর ক্ষেত্রেও তা তাঁর মহত্ত্ব বা মর্যাদার পরিপন্থী নয়।

আপনি কি দেখেন না, ভালো ডাক্তার রোগীর অবস্থার প্রেক্ষিতে তার ঔষধ পরিবর্তন করেন? তিনি সর্বদা রোগীর জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা প্রদানের চেষ্টা করেন। কেউই তার এই ব্যবস্থাকে অজ্ঞতা বা মূর্খতা বলে গণ্য করে না। কাজেই অনাদি-অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী সর্বজ্ঞানী মহান স্রষ্টার এইরূপ প্রজ্ঞাময় পরিবর্তনকে আমরা কীভাবে অজ্ঞতা বলে অপব্যাখ্যা দিতে পারি?'[১]

ড. বিলাল ফিলিপ্স তার বইয়ে নাসখের তিনটি মৌলিক কারণ উল্লেখ করেছেন—

» আসমানি আইনসমূহকে ধীরে ধীরে পূর্ণতার স্তরে নিয়ে যাওয়া।

» ঈমানদারদের পরীক্ষা করা। কখনো তাদের একটি আইন মানতে বলা হয় আর কিছু কিছু জায়গায় তাদের সে আইন মানতে বারণ করা হয়। এভাবে পরীক্ষা করা হয়, ঈমানদাররা সবসময় আল্লাহর আইন মানতে কতটুকু প্রস্তুত।

» কখনো কঠিন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ঈমানদারদের পুরস্কার অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া হয়। কারণ, কাঠিন্য যত বেশি, পুরস্কারও বেশি। আবার সহজ আইন প্রণয়ন করে ঈমানদারদের একটু বিশ্রাম প্রদান করে এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, আল্লাহ মূলত তাদের কল্যাণই কামনা করেন। যেমন— প্রথম দিকে রাতের সালাত আদায় করার পর পরের দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল

---

[১] *ইযহারুল হক*, আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪৬৭-৪৬৮

Scanned by CamScanner

প্রকার পানাহার ও সহবাস নিষিদ্ধ ছিল। এই আইনটি কিছুটা কঠিন। পরবর্তী সময়ে এই আইন রহিত করে রাতের বেলা পানাহার ও স্ত্রীর নিকট গমন করাকে বৈধ করা হয়।[১]

যেসব বিষয় রহিত হয় না

রহিত হওয়ার বিষয়টা নিয়ে তখনই আপত্তি তোলা যেতে পারে, যখন একই কিতাবের কোনো কাহিনি বা ঘটনা, ভবিষ্যৎদ্বাণী কিংবা বিভিন্ন উপমা সেই কিতাবেই রহিত করা হয়। আমরা মানুষেরা এটা প্রায়ই করি। নিজেদের লেখা বইয়ে কোনো তথ্যের ভুল থাকলে তা সংশোধন করি; কিন্তু স্রষ্টার পক্ষে ভুল তথ্য দেওয়া অশোভন। কুরআন তথ্যের ও ভবিষ্যৎদ্বাণীর রহিতকরণ না করে হুকুমের রহিতকরণ করে আমাদের আরো পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে এটা মানুষের তৈরি কোনো বই নয়। এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে—যিনি তাঁর বান্দাদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

অনেকে দাবি করেন, বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের কাহিনি কুরআন দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। ব্যাপারটা মোটেও সেরকম নয়। রহিতকরণ হুকুমের হয়ে থাকে, কাহিনির নয়। তাছাড়া বাইবেলের মধ্যে অনেক মিথ্যা কাহিনি রয়েছে। যেমন—

» লুত আলাইহিস সালাম মদ খেয়ে মাতাল হন এবং তার দুই মেয়ের সাথে পরপর দুই রাতে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। ফলে তার দুই মেয়ে পিতার দ্বারা গর্ভবতী হয়।[২] (নাউযুবিল্লাহ)

» দাউদ আলাইহিস সালাম দূর থেকে উরিয়র স্ত্রী বাতসেবাকে নগ্ন অবস্থায় গোসল করতে দেখে তাকে প্রাসাদে ডেকে পাঠান এবং বাতসেবার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। ফলে বাতসেবা গর্ভবতী হয়। বিপদ বুঝতে পেরে, তিনি সেনাপতিকে পরামর্শ দেন কৌশলে যুদ্ধের মাঠে উরিয়কে হত্যা করার জন্য। এভাবে উরিয় নিহত হন আর দাউদ আলাইহিস সালাম বাতসেবাকে ভোগ করেন।[৩] (নাউযুবিল্লাহ)

---

[১] *কুরআন বোঝার মূলনীতি*, ড.বিলাল ফিলিপ্স, সিয়ান পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা : ২২৮-২২৯

[2] *Holy Bible*, Genesis, chapter : 19, verse : 30-38

[৩] *Holy Bible*, 2 Samuel, chapter : 11, verse : 1-27

Scanned by CamScanner

» সুলাইমান আলাইহিস সালাম শেষ বয়সে মেয়েলোকের পাল্লায় পড়ে ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যান। তিনি মূর্তিপূজা শুরু করেন।[১] (নাউযুবিল্লাহ)

» হারুন আলাইহিস সালাম একটি বাছুরের মূর্তি তৈরি করেন এবং এর উপাসনা করা শুরু করেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি বনি ইসরাইলকে নির্দেশ দিয়েছেন এই বাছুরটাকে উপাসনা করতে।[২] (নাউযুবিল্লাহ)

আমরা বিশ্বাস করি, সকল নবিই নিষ্পাপ। তাই এই কাহিনিগুলো সুনিশ্চিত মিথ্যা ও বাতিল। আমরা একথা বলি না যে, বাইবেলে বর্ণিত এসব ঘটনা কুরআন দ্বারা রহিত। মূলত কাহিনিগুলোই বানোয়াট ও মনগড়া, যা দিয়ে বাইবেলের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে।

রহিতকরণ কি কেবল কুরআনেই আছে?

আগেই উল্লেখ করেছি, ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা এটা বিশ্বাস করতে পারে না যে, স্রষ্টার অভিধানে 'রহিত' শব্দটি থাকতে পারে। যদিও তাদের বাইবেলে প্রচুর 'রহিতকরণ'-এর ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। কয়েকটি উল্লেখ করছি—

» বিকৃত বাইবেল অনুসারে, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী সারা তার সৎ-বোন ছিলেন। যার অর্থ, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্য নিজের সৎ-বোনকে বিয়ে করা বৈধ ছিল; কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা দেখতে পাই, পুরাতন নিয়মে (ওল্ড টেস্টামেন্টে) সৎ-বোনকে বিয়ে করার বিধান নিষিদ্ধ করা হয়।[৩]

» বাইবেল অনুসারে, মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তে, যেকোনো কারণে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারেন। স্ত্রী ঘর থেকে বের হয়ে গেলে অন্য পুরুষ তাকে বিয়ে করতে পারেন। যিশুখ্রিষ্ট ব্যভিচারের কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া রহিত করেন। আর যে এমন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করবে, তাকেও ব্যভিচারী হিসেবে সাব্যস্ত করেন।[৪]

---

[১] *Holy Bible,* 1 kings, chapter : 11, verse : 1-13

[২] *Holy Bible,* Exodus, chapter : 32, verse : 1-35

[৩] *Holy Bible,* Genesis, chapter : 20, verse : 12-কে রহিত করেছে Leviticus- chapter : 18, verse : 9

[৪] *Holy Bible,* Deuteronomy, chapter : 24, verse : 1-2 কে রহিত করেছে Gospel of Matthew, Chapter : 5, verse : 31-32

Scanned by CamScanner

» বাইবেল অনুসারে, শনিবার (সাবত)-কে সম্মান করে সকল প্রকার কাজ থেকে বিরত থাকা মুসা আলাইহিস সালামের ব্যবস্থায় একটি অলঙ্ঘনীয় চিরস্থায়ী বিধান; কিন্তু বাইবেলেই আমরা দেখতে পাই, যিশুখ্রিষ্ট বারবার এই আইন ভঙ্গ করছেন।[১] বর্তমানেও খ্রিষ্টানরা বাইবেলের এই বিধান পালন করে না। অথচ তাদের অনেক স্কলারই দাবি করে, পুরো বাইবেলই ঈশ্বরপ্রদত্ত আর সেখানে কোনো রহিত হওয়ার বিধান নেই। তারা কি জানে, এই বাইবেল অনুসারেই চিরস্থায়ী 'সাবাত' ভঙ্গ করার কারণে তাদের সবার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত? কারণ, বাইবেল পড়লে জানা যায়, শনিবারের দিনে শুধু কাঠ কুড়ানোর অপরাধে এক লোককে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়েছিল।[২]

» বিকৃত ইঞ্জিলেই এক বিধান কর্তৃক আরেক বিধান রহিত হওয়ার প্রমাণ মেলে। মথি লিখিত সুসমাচারে (গসপেলে) যিশু তার শিষ্যদেরকে জেন্টাইল (যারা ইহুদি নয়)-দের কাছে যেতে নিষেধ করেন।[৩] তিনি আরো বলেন, বনি ইসরাইল ছাড়া তিনি আর কারো কাছে প্রেরিত হননি।[৪] জেন্টাইলদের তিনি 'কুকুর' বলে সম্বোধন করেছেন।[৫] আবার অন্য সুসমাচার পড়লে জানা যায়, সেই তিনিই সকল সৃষ্টির নিকট তার সুসমাচারগুলো প্রচার করতে বলছেন।[৬]

» 'নিশ্চয়ই জান্নাত রয়েছে তরবারির ছায়াতলে'[৭]—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিসকে অনেক খ্রিষ্টান স্কলাররা ব্যঙ্গ করে থাকেন।

» অথচ বাইবেল অনুসারে, যিশুখ্রিষ্ট বলেছেন—'এ কথা ভেবো না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি। আমি শান্তি দিতে আসিনি, বরং তরবারি দিতে

---

[১] Holy Bible, Exodus, chapter : 35, verse : 2-3 কে রহিত করেছে Gospel of John-chapter : 5, verse : 16

[২] *Holy Bible*, Numbers, chapter : 15, verse : 32-36

[৩] *Holy Bible*, Gospel of John, chapter : 10, verse : 5

[৪] *Holy Bible*, Gospel of Matthew, chapter : 15, verse : 24

[৫] *Holy Bible*, Gospel of Matthew, chapter : 7, verse : 6

[৬] Gospel of Mark, chapter : 16

[৭] *সহিহ মুসলিম* : ১৫১১

Scanned by CamScanner

এসেছি।'[১] আবার সেই তিনিই ইহুদিদের হাতে বন্দি হওয়ার প্রাক্কালে তার সাথি পিতরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যারা তরবারি চালায়, তারা তরবারিতেই মারা পড়ে।'[২]

সুতরাং, শুধু কুরআনেই নয় বরং পূর্ববর্তী কিতাবগুলো বিকৃত হওয়ার পরেও তাতে অনেকগুলো রহিত বিধান রয়েছে। সমস্যা হচ্ছে, যে চোখ দিয়ে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা কুরআনকে দেখে, সেই একই চোখে তারা বাইবেলকে দেখে না।

আমাদের বর্তমান প্রজন্মের একটি মূল সমস্যা হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনার দাবি করার পরেও ইসলামবিদ্বেষীদের ছুড়ে দেওয়া কিছু প্রশ্নে আমরা সংশয়বাদী হয়ে যাই। আমরা দাবি করি, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আমাদের নিজের বুদ্ধি ও বিবেক ব্যবহার করতে বলেছেন। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে, আল্লাহ আমাদেরকে আকল ব্যবহার করতে বলেছেন, চিন্তা করতে বলেছেন; কিন্তু তিনি আমাদের আকলের পূজা করতে বলেননি। আমরা অবশ্যই সত্যকে জানার চেষ্টা করব; কিন্তু যিনি মহাবিশ্বের সবকিছু জানেন, তাঁর জ্ঞানের সাথে আমাদের আকলের সবকিছু সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে—এমনটা ভাবাই বা কতটুকু বুদ্ধিমানের কাজ?

শান্তি তাদের ওপর বর্ষিত হোক—যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে।

[১] *Holy Bible*, Gospel of Matthew, chapter : 10, verse : 34

[২] Gospel of Matthew, chapter : 26, verse : 52

Scanned by CamScanner

বকরির পেটে কুরআনের আয়াত!

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

সুনানু ইবনি মাজাহ-য় বর্ণিত একটি রিওয়ায়েত ব্যবহার করে খ্রিষ্টান মিশনারি ও নাস্তিক-মুক্তমনারা দাবি করতে চায়, কুরআনের কিছু আয়াত চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে। কেননা, সেগুলো যে পৃষ্ঠায় লেখা ছিল, সেটিকে একটি বকরি খেয়ে ফেলেছিল। কুরআনের সংরক্ষণকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ইসলামবিরোধীরা যেসব (অপ) যুক্তি দাঁড় করায়, তার মধ্যে অন্যতম এবং বিখ্যাত (অথবা কুখ্যাত) যুক্তি এটি। এই লেখায় সেই রিওয়ায়েতটিকে বিশ্লেষণ করে সত্য উন্মোচন করা হবে ইনশা আল্লাহ।

ইবনু মাজাহ-র রিওয়ায়েতটি হচ্ছে—

عن عَائِشَةَ قالت: "لقد نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا وَلَقَدْ كان فى صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِى، فلما مَاتَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ؛ دخل دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا

অর্থ : আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, 'রজমের ও বয়স্কদের দশ ঢোক দুধপানের আয়াত নাযিল হয়েছিল এবং সেগুলো একটি সহিফায় (লিখিত) আমার খাটের নিচে সংরক্ষিত ছিল। যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেন এবং তার বিদায়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম, তখন একটি বকরি এসে তা খেয়ে ফেলে।'[১]

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৯৪৪

Scanned by CamScanner

রিওয়ায়েতটির বিশুদ্ধতা কতটুকু :

কোনো দাবি পেশ করতে হলে সবার আগে যাচাই করা জরুরি, এর দলিল হিসেবে পেশকৃত রিওয়ায়েতের বিশুদ্ধতা কতটুকু।

মুহাদ্দিসদের মতে, রিওয়ায়েতটিতে কিছু সমস্যা রয়েছে। এই রিওয়ায়েতের একজন বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক এটি বর্ণনা করছেন عن (থেকে) শব্দ ব্যবহার করে। যে কারণে বর্ণনাটি যয়িফ (দুর্বল) হয়ে গেছে। কেননা, তিনি একজন তাদলিসকারী।[১][২]

*মুসনাদু আহমাদ*ও একই রিওয়ায়েত পাওয়া যায়। শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ তার *মুসনাদু আহমাদ*রে টীকাগ্রন্থে বলেছেন, এর সনদ যয়িফ (দুর্বল) এবং এর মতন (ভাষ্য)-এ নাকারাত (হাদিস প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মতো কিছু সমস্যা) আছে।[৩]

এই রিওয়ায়েত কোনো উপায়েই কুরআনের বিশুদ্ধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না। এই রিওয়ায়েতটি সহিহ হলেও কুরআনের সংরক্ষণ প্রশ্নবিদ্ধ হত না। কারণ, এই রিওয়ায়েত অনুযায়ী দাবিকৃত 'হারিয়ে যাওয়া' আয়াত দুটির একটি আয়াত ছিল রজমের[৪] ব্যাপারে।

কিন্তু, অন্য একাধিক বর্ণনাতে আমরা দেখতে পাই যে, রজমের ব্যাপারে বিধান নাযিল হয়েছিল; কিন্তু, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটিকে কুরআনের

---

[১] যে বর্ণনাকারী হাদিসের সনদে খুবই সূক্ষ্মভাবে নিজের শিক্ষক বা শিক্ষকের শিক্ষককে (দুর্বল হওয়ার কারণে বা অন্য কোনো কারণে) বাদ দেন কিংবা নিজের শিক্ষককে তার প্রসিদ্ধ নামের পরিবর্তে ভিন্ন আরেকটি অপরিচিত নাম বা উপাধিতে উল্লেখ করেন তাকে তাদলিসকারী বলা হয়। নিজের শিক্ষককে বাদ দিলে সেটাকে বলা হয় 'তাদলিসুল ইসনাদ', শিক্ষকের শিক্ষককে বাদ দিলে বলা হয় 'তাদলিসুত তাসবিয়া', আর নিজের শিক্ষককে ভিন্ন পরিচয়ে উল্লেখ করলে বলা হয় 'তাদলিসুশ শুয়ুখ'। তাদলিসের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুন এই আর্টিকেলটি : http : //www.islamic-awareness.org/Hadith/Ulum/asb4.html

[২] *তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম*, মুফতি তাকি উসমানি, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৬৯, দারুল ইহইয়া আত-তুরাসিল আরাবি, বৈরুত

[৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৬৩১৬

[৪] বিবাহিত পুরুষ কিংবা নারী ব্যভিচার করলে তাদের পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড প্রদানকে রজম বলে।

Scanned by CamScanner

অংশ হিসাবে লিপিবিদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, এটি কুরআনের অবিচ্ছেদ্য কোনো অংশ ছিল না।

বর্ণনাগুলো নিম্নরূপ—

[ক] কাসির ইবনুস সালত রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, যায়িদ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যখন কোনো বিবাহিত পুরুষ অথবা নারী ব্যভিচার করে, তাদের উভয়কে রজম করো।'

(এটি শুনে) আমর বলেন, 'যখন এটি নাযিল হয়েছিল, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম এবং এটি লিপিবদ্ধ করব কি-না তা জানতে চাইলাম। তখন মনে হলো, তিনি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা লিপিবদ্ধ করা অপছন্দ করলেন।'[১]

[খ] এই আয়াতের ব্যাপারে কাসির ইবনুস সালত বলেন, তিনি (কাসির), যায়িদ ইবনু সাবিত ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম আলোচনা করছিলেন, কেন একে কুরআনের মুসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তাদের আলোচনা শুনছিলেন। তিনি বললেন যে, এ ব্যাপারে তিনি তাদের থেকে ভালো জানেন। তিনি তাদের বললেন, তিনি (উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়েছিলেন এবং জিজ্ঞেস করেছিলেন—

يَا رَسُوْلَ اللهِ أُكْتُبْنِيْ آيَةَ الرَّجْمِ، قَالَ لَا أَسْتَطِيْعُ ذَاكَ

হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে রজমের আয়াতটি লিখে দেওয়া হোক। তিনি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি তা করতে পারব না।[২]

যদি আলোচ্য আয়াত স্থায়ীভাবে কুরআনের অংশ হিসেবে নাযিল হতো, তাহলে কেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা লিখে দিতে বললেন না? এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, এটি ছিল সেই সমস্ত মানসুখ বা রহিত আয়াতের একটি, যা

---

[১] *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৮০৭১

[২] *আস-সুনানুল কুবরা,* বাইহাকি : ১৬৯১৩; *সুনানুন নাসায়ি :* ৭১১০

Scanned by CamScanner

কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অস্থায়ীভাবে নাযিল হয়েছিল। এটি রহিত হয়েছে, যা স্বয়ং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। কাজেই সাহাবিগণ বা উম্মুল মুমিনিনগণ এই আয়াত 'হারিয়ে ফেলেছেন'—তা নিতান্তই অসার কথা।

দ্বিতীয় যে আয়াত 'হারিয়ে গেছে' বলে দাবি করা হয়, সেটি হলো বয়স্কদের দশ ঢোক দুধপান সংক্রান্ত আয়াত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটিও মানসুখ বা রহিত আয়াত। *সহিহ মুসলিমে* এ-সংক্রান্ত একটি বর্ণনা নিম্নরূপ—

"

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : " كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল যে, দশবার দুধপানে বিবাহ হারাম হওয়া বা মাহরাম হওয়া সাব্যস্ত হয়। তারপর (কুরআন নাযিলের শেষ দিকে এসে) তা পাঁচবার দুধপানে হারাম হওয়ার বিধান দ্বারা রহিত হয়ে যায়। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেন; কিন্তু এ আয়াতটি (রহিত হলেও অজ্ঞাতবশত কিছু মানুষ কর্তৃক) কুরআনের আয়াত হিসাবে তিলাওয়াত করা হতো।[১]

পাঁচবার দুধপানের বিধানটিও একটি মানসুখ বা রহিত বিধান। এ ব্যাপারে স্বয়ং উম্মুল মুমিনিন রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে।

'সাহলা বিনতু সুহাইল রাযিয়াল্লাহু আনহুমা ছিলেন আমির ইবনু লুয়াই গোত্রের, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, সালিমকে আমরা পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলাম। সে যখন আমার ঘরে প্রবেশ করে, তখন আমি কেবল একটি কাপড় পরে ছিলাম (অর্থ্যাৎ মাথায় কোনো কাপড় ছিল না)। আর আমার ঘরও মাত্র একটি। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ বিষয়ে আমাদের কথা হলো তাকে পাঁচবার দুধপান করাও।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৪৫২

Scanned by CamScanner

নবিজির স্ত্রীগণ এটা মানতে নারাজ ছিলেন যে, এভাবে দুধপানের দ্বারা কোনো পুরষ তাদের মাহরামে পরিণত হবে। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে উদ্দেশ্য করে তারা বলতেন আল্লাহর কসম, আমরা মনে করি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহলা বিনতু সুহাইল রাযিয়াল্লাহু আনহাকে যে অনুমতি দিয়েছিলেন, তা কেবল সালিম রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য নবিজির পক্ষ থেকে বিশেষ ছাড় হিসেবে ছিল। কসম আল্লাহর, এভাবে দুধপান করানোর দ্বারা কেউ আমাদের মাহরামে পরিণত হতে পারবে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল সহধর্মিণী এই মতের ওপর অটল ছিলেন।'[১]

এই বিবরণগুলো দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, পাঁচবার ও দশবার দুধপানের বিধান রহিত হয়ে গিয়েছিল।

এছাড়া উল্লেখ্য যে, যতদিন ধরে কুরআন সংকলিত হয়েছে, আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার পূর্ণ সময় জীবিত ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সংকলনের সময় এবং উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সংকলনের পুরো সময় জুড়েই আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একজন গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানকারী ছিলেন। বিশেষত, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক কুরআন সংকলনের সময়ে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে সংকলনকর্ম যাচাই করা হতো।[২]

যদি সত্যি সত্যিই কুরআনের আয়াত হারিয়ে যাওয়ার মতো এমন মহাদুর্ঘটনা ঘটত, তাহলে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অবশ্যই সে ব্যাপারে সাহাবিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। সে সময়ে প্রচুর পরিমাণে হাফিয সাহাবি জীবিত ছিলেন, যারা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কুরআন শিখেছেন; কিন্তু আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কখনোই এমন কিছু করেননি।

আর যদি এমনও হয়ে থাকে, আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার খাটের নিচ থেকে কুরআনের কিছু আয়াত আসলেই বকরি খেয়ে ফেলেছিল এবং আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সে ব্যাপারে কোনো সাহাবিরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি বরং চেপে গিয়েছেন, (নাউযুবিল্লাহ) [এমন ধৃষ্টতামূলক তত্ত্ব কোনো কোনো খ্রিষ্টান মিশনারি প্রচার

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ২০৬১

[২] *তারিখুল মাদিনা*, ইবনু শাব্বা, পৃষ্ঠা : ৯৯৭

Scanned by CamScanner

করে থাকেন] তবুও এর দ্বারা 'কুরআনের কিছু আয়াত হারিয়ে গেছে'—এই তত্ত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ, কুরআন মূলত লিখিত কোনো কিতাব নয়, বরং অগণিত মানুষের মুখস্থ করা গ্রন্থ। কুরআন নাযিলের পর থেকেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিগণ তা মুখস্থ করেছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদান মাসের শুরু থেকে তাহাজ্জুদে, তারাবিহে ও তিলাওয়াতে অগণিতবার কুরআন খতম করেছেন।

এ ব্যাপারে সকল যুগের অবস্থা অভিন্ন। কুরআনের লিখিতরূপ শুধু সহায়ক মাত্র। কুরআন প্রথম অবতরণ থেকেই প্রতিটি মুমিনের প্রতিদিনের পাঠ্যবিষয়। প্রতিদিন নিজের সালাতে, জামাআতের সালাতে ও সাধারণভাবে প্রত্যেক মুমিন তা তিলাওয়াত করেন বা শোনেন। বর্তমান সময়ের চেয়ে সাহাবিগণের যুগে কুরআন মুখস্থ করার আগ্রহ অনেক বেশি ছিল। হাজার হাজার হাফিয সাহাবি-তাবিয়ি মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে ছিলেন। সুতরাং দুয়েকটি আয়াত কেন, কুরআনের সকল আয়াতও যদি বকরি খেয়ে ফেলত, তবু একটি আয়াতও 'হারিয়ে যাওয়া' সম্ভব ছিল না। কেননা, হাজার হাজার হাফিয সাহাবি ও তাবিয়ি ওই যুগে ছিলেন—যাদের স্মৃতিতে পূর্ণ কুরআন সংরক্ষিত ছিল। পুরো মুসলিম বিশ্বে প্রতিটি ওয়াক্তে, প্রতিটি রাকআতে জনসমাগমে একই কুরআন পাঠ করা হত। সেই যুগ থেকে আজ পর্যন্ত একই অবস্থা। কাজেই বকরি খাওয়ার ফলে কিছু আয়াত চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে—এটা নিতান্তই হাস্যকর অভিযোগ।

আজও যদি কুরআনের সকল লিখিত পাণ্ডুলিপি, পিডিএফ কপি, অনলাইন কুরআন, কুরআনের মোবাইল অ্যাপস—এ সকল কিছু ধ্বংস করে ফেলা হয়, তবুও কুরআনের একটি অক্ষরও হারিয়ে যাবে না। কেননা, কোটি কোটি হাফিযে কুরআন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন। তাদের স্মৃতি থেকে আবারও সম্পূর্ণ কুরআন অনায়াসে পুনরুদ্ধার করা যাবে।

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা নবিজিকে বলেন—

وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء

আমি আপনার ওপর কিতাব নাযিল করেছি, যা পানি দ্বারা ধুয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।[১]

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৮৬৫

Scanned by CamScanner

পানি দ্বারা সেই জিনিস ধুয়ে যাওয়া সম্ভব, যা কাগজের ওপর কালি দ্বারা লেখা হয়। যা স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে, তার পক্ষে ধুয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তা খাওয়াও যায় না, হারিয়েও যাওয়া না।

আল্লাহই ভালো জানেন।

তথ্যসূত্র ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

» *http : //icraa.org/*

» *http : //www.letmeturnthetables.com/*

» *কিতাবুল মোকাদ্দাস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম – খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর*

Scanned by CamScanner

কুরআনের আয়াত-সংখ্যার গণনায় ভিন্নতা কেন?

মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন

নাস্তিকের প্রশ্ন : 'কুরআনের একেক গণনা পদ্ধতিতে কুরআনের আয়াত-সংখ্যা মোট কত' এই নিয়ে বেশ মতপার্থক্য দেখা যায়। এটা কি কুরআনের ত্রুটি নয়? (নাউযুবিল্লাহ)

উত্তর : প্রথমে এই অভিযোগ সত্য কি না—তা নিয়ে সামান্য বিশ্লেষণে যাওয়া যাক—

কুরআনুল কারিমের আয়াত-সংখ্যা গণনার জন্য একটি বিশেষ শাস্ত্র আছে, যার মাধ্যমে কুরআনে প্রত্যেক সুরার মোট আয়াত-সংখ্যা ও পুরো কুরআন মাজিদের মোট আয়াত-সংখ্যা জানা যায়, যাকে ইলমুল কিরাআত (علم القراءت) ও ইলমুত তাজউয়িদের (علم التجويد) ইমামগণ ইলমু আদাদি আয়াতিল কুরআন (علم عدد الآيات القرآن) নামে জানেন। যার অন্যতম বিষয় হলো, ফাওয়াসিলুল আয়াত (فواصل الآيات) বা আয়াতের সূচনা-পরিসমাপ্তি জানা। জানিয়ে রাখা ভালো যে, এই শাস্ত্র উলুমুল কুরআনের একটি পৃথক শাখা।

'ইলমুল আদাদ'—এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার ফসল। তিনি সাহাবিদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তারই ফসল হলো এই ইলমুল আদাদ। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবিজির ওপর দীর্ঘ ২৩ বছরে বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছিল। বিভিন্ন সুরার বিভিন্ন অংশ

Scanned by CamScanner

এভাবে একে একে নাযিল হতে থাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবিগণ সেই আয়াত হিফয (মুখস্থ) করে নিতেন। সাহাবিগণ আয়াত মুখস্থ করার পাশাপাশি তা কোন সুরার অংশ, কোন আয়াতের শুরু কোথা থেকে হয়েছে বা কোন আয়াত কোথায় শেষ হয়েছে, তা-ও হিফয করে নিতেন। পরবর্তী সময়ে প্রজন্ম পরম্পরায় তাদের কাছ থেকে তাবিয়ি ও তাবিয়িদের থেকে তাবি-তাবিয়িগণ কুরআন এভাবেই শিখে নিয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে তাদের থেকে ইলমুল কিরাআতের ইমামগণ এভাবেই শিখেছেন আর সেভাবেই এই-সংক্রান্ত কিতাবসমূহে ব্যাপকভাবে ও অসংখ্য হাদিস ও আসার দ্বারা তা বর্ণিত হয়ে এসেছে।

সাধারণত কয়েক ধরনের বা কয়েক এলাকার গণনা পদ্ধতি প্রসিদ্ধ।

এক. মাদানি গণনা

মাদানি গণনা দুই ধরনের—

[ক] প্রথম মাদানি গণনা

এই গণনা পদ্ধতি ইমাম নাফি ইবনু আবি নুয়াইম মাদানি[১] আবু ইয়াযিদ ইবনু কা'কা[২] এবং শাইবা ইবনু নিসাহ[৩] থেকে বর্ণনা করেন। এই গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী কুরআনের আয়াত-সংখ্যা ৬২১৭।

[খ] দ্বিতীয় মাদানি গণনা

এই গণনা পদ্ধতি ইমাম ইসমাইল ইবনু জাফর মাদানি[৪] সুলাইমান ইবনু মুসলিম ইবনি জামমায থেকে বর্ণনা করেন এবং তিনি (সুলাইমান) আবু জাফর[৫] ও শাইবা ইবনু নিসাহ[৬] থেকে বর্ণনা করেন। আবু জাফরের গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী

---

[১] মৃত্যু—১৬৯ হিজরি

[২] মৃত্যু—১৩২ হিজরি

[৩] মৃত্যু—১৩০ হিজরি

[৪] মৃত্যু—১৮০ হিজরি

[৫] মৃত্যু—১৩২ হিজরি

[৬] মৃত্যু—১৩০ হিজরি

Scanned by CamScanner

আয়াত-সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২১৪, আর শাইবা ইবনু নিসাহের গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী আয়াত-সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২১০টি।

দুই. মক্কি গণনা

এই গণনা পদ্ধতির ভিত্তি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনু কাসির[১]। এই গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী মোট আয়াত-সংখ্যা ৬২২০ টি।

তিন. শামি গণনা

এই গণনা পদ্ধতির ভিত্তি হলেন ইয়াহইয়া ইবনু হারিস আয-যিমারি[২]। এই গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী মোট আয়াত-সংখ্যা ৬২২৬টি।

চার. বসরি গণনা :

এই গণনার ভিত্তি হলেন আইয়ুব ইবনু মুতাওয়াক্কিল ও আসিম আল-জাহদারি, তারা দুজনেই ইলমুল কিরাআতের ইমাম ছিলেন। এই গণনায় আয়াত-সংখ্যা ৬২০৪ টি।

পাঁচ. কুফি গণনা :

এই গণনার মূল বর্ণণাকারী হলেন তাবিয়ি আবু আব্দির রহমান আস-সুলামি[৩]। এই গণনা অতীতে এবং বর্তমানে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ছিল এবং এখনো আছে। এই গণনা পদ্ধতিতে আয়াত-সংখ্যা ৬২৩৬টি, এই গণনা অনুযায়ীই সাধারণত বর্তমানে মুসহাফগুলোতে [পূর্ণ কুরআনের কপি] বিভিন্ন চিহ্ন দেওয়া হয়ে থাকে। ইলমুল আদাদ বা কুরআনের আয়াত-সংখ্যার শাস্ত্রের ওপর ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই প্রচুর বইপত্র রচিত হয়ে আসছে। প্রায় শতাধিক বিখ্যাত বই এই শাস্ত্র নিয়ে রচিত হয়েছে। নিম্নে অঞ্চলভিত্তিক গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত কিছু বইয়ের নাম উল্লেখ করা হলো—

---

[১] মৃত্যু—১২০ হিজরি

[২] মৃত্যু—১৪৫ হিজরি

[৩] মৃত্যু—৭৪ হিজরি

Scanned by CamScanner

মদিনাবাসীর নিয়ম অনুযায়ী (أهل المدنية) :

» কিতাবু আদাদিল মাদানিয়্যিল আওয়াল লি নাফি (كتاب عدد المدنى الأول لنافع)

» কিতাবুল আদাদিস সানি আন নাফি (كتاب العدد الثانى عن نافع)

» কিতাবুল আদাদ লি ঈসা (كتاب العدد لعيسى)

» কিতাবু ইসমাইল ইবনি আবি কাসির ফি মাদানিয়্যিল আখির (كتاب إسماعيل بن أبى كثير فى مدنى الأخر)

মক্কাবাসীর নিয়ম অনুযায়ী (أهل مكة) :

» কিতাবুল আদাদ লি আতা ইবনি ইয়াসার (كتاب العدد لعطاء بن يسار)

কুফাবাসীর নিয়ম অনুযায়ী (أهل الكوفة) :

» কিতাবুল আদাদ লি খলফ (كتاب العدد لخلف)

» কিতাবুল আদাদ লি মুহাম্মাদ ইবনি ঈসা (كتاب العدد لمحمد بن عيسى)

বসরাবাসীর নিয়ম অনুযায়ী (أهل البصرة) :

কিতাবুল হাসান ইবনি আবি হাসান ফিল আদাদ (كتاب الحسن بن أبى حسن فى العد د)

শামবাসীর নিয়ম অনুযায়ী (أهل الشام) :

» কিতাবু খালিদ ইবনি মাদান (كتاب خالد بن معدان)

» কিতাবু ইয়াহইয়া ইবনিল হারিস আয-যিমারি (كتاب يحي بن الحارث الذمارى)

অভিযোগকারীরা বলে—কুরআন ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি, সেই কারণেই কুরআনের আয়াত গণনায় পার্থক্য হয়েছে (আস্তাগফিরুল্লাহ)। বিভিন্ন গণনা পদ্ধতির মধ্যে মতপার্থক্যের কিছু উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক; এতে করে তাদের অভিযোগের অন্তঃসারশূন্যতা পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ।

Scanned by CamScanner

প্রথমেই আয়াত-সংখ্যায় কীভাবে মতপার্থক্য হয়ে থাকে কিংবা এই মতপার্থক্যের স্বরূপ কী—তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

আয়াত-সংখ্যায় সাধারণত নিম্নবর্ণিত উপায়ে মতপার্থক্য হয়ে থাকে—

» আয়াত গণনা পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য

» আয়াত গণনা পদ্ধতি এক হলেও আয়াতের সূচনা-শেষ নির্ধারণে (فواصل) মতভেদ হওয়ার কারণে;

এবার কিছু উদাহরণ দেখা যাক—

সুরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝٤

সুরা ইখলাসে রয়েছে ৪টি আয়াত। কুফি, বাসরি, মাদানি (১ম ও ২য়) গণনা পদ্ধতিতে এই সুরাতে ৪টি আয়াত আছে। তবে, মক্কি ও শামি গণনা পদ্ধতিতে এই সুরার আয়াত-সংখ্যা ৫টি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কীভাবে? দেখে নিই—

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۝٣ وَلَمْ يُولَدْ ۝٤ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝٥

এটি মক্কি ও শামি গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী সুরা ইখলাস, যেখানে ৫টি আয়াত দেখা যাচ্ছে। এটা কি এই কারণে যে এই গণনাতে একটি অতিরিক্ত আয়াত সংযুক্ত হয়েছে? মোটেও তা নয়; বরং এখানে দেখা যাচ্ছে, কুফি, বাসরি ও মাদানি পদ্ধতিতে (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ) এই অংশটিকে একটি আয়াত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে যেখানে মক্কি ও শামি গণনায় (لَمْ يَلِدْ) অংশকে একটি ও (وَلَمْ يُولَدْ) অংশকে আরেকটি পৃথক আয়াত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কোনো প্রকার সংযোজন বা বিয়োজনের কারণে এই পার্থক্য ঘটেনি।

আরেকটি উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক—

Scanned by CamScanner

সুরা কুরাইশ

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ① إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ② فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ③ الَّذِي
أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ④

কুফি, বাসরি ও শামি—এই তিন গণনা পদ্ধতিতে সুরা কুরাইশের আয়াত-সংখ্যা ৪—যা আমরা ওপরে দেখলাম। আর মক্কি ও মাদানি (১ম ও ২য়) গণনা পদ্ধতিতে এই সুরার আয়াত-সংখ্যা ৫টি। কীভাবে?

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ① إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ② فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ③ الَّذِي
أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ ④ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ⑤

এই গণনা পদ্ধতিটি মক্কি ও মাদানির। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ওপরের কুফি, বাসরি ও শামি—এই তিন পদ্ধতির গণনা পদ্ধতিতে (الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) এই অংশটিকে পরিপূর্ণ একটি আয়াত হিসেবে গণ্য করা হলেও বাকি দুই পদ্ধতি অর্থাৎ, মক্কি ও মাদানি গণনা পদ্ধতিতে (الذى أطعمهم من جوع)-কে একটি ও (وآمنهم من خوف)-কে আরেকটি আলাদা আয়াত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে মূল পাঠ সবসময়ই এক ও অভিন্নই রয়েছে।

কোনো সংযোজন বা বিয়োজনের কারণে এই পার্থক্য হয়নি।

সুরা আসর

وَالْعَصْرِ ① إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ② إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③

সুরা আসরের আয়াত-সংখ্যা সকল প্রকার গণনা পদ্ধতি অনুসারেই ৩টি। দ্বিতীয় মাদানি গণনা ছাড়া সকল প্রকার গণনা পদ্ধতিতে এভাবেই আয়াতের সূচনা-শেষ বা ফাওয়াসিল (فواصل) নির্ধারণ করা হয়েছে।

আর মাদানি দ্বিতীয় পদ্ধতিতে নিম্নরূপভাবে ফাওয়াসিল (فواصل) নির্ধারণ করা হয়েছে—

وَالْعَصْرِ ① إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ② إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ③
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ④

Scanned by CamScanner

এখানে দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় মাদানি ছাড়া অন্যান্য সকল গণনায় (وَٱلْعَصْرِ) ও (إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ)-কে আলাদা আয়াত গণনা করা হয়েছে। তবে, মাদানি দ্বিতীয় পদ্ধতিতে দুইটি অংশকে একত্রে একটি আয়াত বলে পরিগণিত করা হয়েছে। আবার, মাদানি দ্বিতীয় পদ্ধতিতে (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ) ও (وَتَوَاصَوا بِٱلصَّبْرِ)-কে আলাদা আয়াত হিসেবে গণ্য করা হলেও অন্যান্য সকল পদ্ধতিতে এই অংশটিকে একটি আয়াত হিসেবেই ধরা হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কুরআনের আয়াত-সংখ্যার মতপার্থক্য কখনোই কুরআনের মূলপাঠের ভিন্নতা বা আয়াত কম-বেশি হওয়ার কারণে হয়নি; বরং তা অন্য কোনো ভিন্ন কারণে হয়েছে যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ ইবনু আবি উমার আল-আনদারাবি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'এই ধরনের পার্থক্য মূলত বাহ্যিক ও নামের পার্থক্য। এই পার্থক্য আসলে ইখতিলাফ নয়। এটা গণনা পদ্ধতির পার্থক্য, কুরআনের আয়াত কম-বেশি হওয়ার পার্থক্য নয়। এই বাহ্য ইখতিলাফের কারণেই কুরআনের মোট আয়াত-সংখ্যা এত, আর কেউ বলে মোট আয়াত-সংখ্যা এত।' (উদাহরণত কুফি গণনায় ৬২৩৬ এবং বসরি গণনায় ৬২০৪...)

তো এখানে বিষয়টি এমন নয় যে, এক পক্ষ কুরআনের আয়াত-সংখ্যাকে বেশি বলছে, আর অপরপক্ষ কম বলছে অথবা একপক্ষ কুরআনের কোনো অংশকে কুরআন বলে মানছে আর অপরপক্ষ (আল্লাহ মাফ করুক) তা কুরআনের অংশ বলে মানছে না। বিষয়টি আদৌ এমন নয়।[১]

এছাড়া ১৬৯ হিজরিতে ইমাম নাফি (যিনি প্রথম মাদানি গণনা পদ্ধতির ইমাম) থেকে ইমাম ওয়ারশ (উসমান ইবনু সায়িদ)-এর বর্ণনাকৃত কিরাআত মোতাবেক (অর্থাৎ প্রথম মাদানি) একটি মুসহাফ ছাপা হয়েছিল, যাতে আয়াতের চিহ্ন লাগানো হয়েছিল কুফি গণনা অনুযায়ী। এতে কোনো সমস্যাই হয়নি দুই আদাদি বা গণনা পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় করতে। যদি গণনা পদ্ধতির পার্থক্য কুরআনের আয়াত কম-বেশি হওয়ার পার্থক্যই হতো (আল্লাহ মাফ করুক), তবে কীভাবে সম্ভব ছিল ইমাম নাফির বর্ণনায় কুফার বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের চিহ্ন লাগানো? যেখানে

---

[১] *আল-ইযাহ ফিল কিরাআত*, পৃষ্ঠা : ২৩২-২৩৩

Scanned by CamScanner

ইমাম ওয়ারশ থেকে ইমাম নাফির (ورش عن نافع) গণনায় মোট আয়াত-সংখ্যা ৬২১৭, আর কুফার গণনায় মোট আয়াত-সংখ্যা ৬২৩৬! (এই মুসহাফটিই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের দেশের মুসহাফগুলোতেও সাধারণত এই গণনা পদ্ধতির ব্যবহার হয়ে থাকে)

সুতরাং বলা যায় যে, কুরআন সংকলনের ভুলের কারণে বা অন্য যেকোনো কারণে ভুলের কারণে কুরআনের আয়াত গণনায় মতভেদ হয়ে থাকে—এই অভিযোগ পুরোপুরি ভুল। এ ধরনের প্রশ্নের উৎপত্তি মূলত ত্রুটিপূর্ণ চিন্তাধারা এবং সংকীর্ণ মনোভাবের ফসল। আল্লাহু আ'লাম।

সহায়ক গ্রন্থ

উক্ত লেখাটি শাইখুনা ও উস্তাযু উলামায়িনা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ লিখিত (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন ও তার ছায়া আমাদের মাঝে দীর্ঘায়িত করুন) মাসিক আল-কাউসারের 'কুরআনুল কারিম সংখ্যা' [প্রকাশকাল : ১৪৩৭ হিজরি/২০১৬ ঈসায়ি; পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা] অবলম্বনে লেখা হয়েছে (দেখতে পারেন—পৃষ্ঠা : ৮৯-১০৬)

Scanned by CamScanner

কবরের আযাব : আগে ও পরে মারা যাওয়া ব্যক্তি কি সমান শাস্তি পাবে?

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

নাস্তিক-প্রশ্ন : ধরা যাক, এক ব্যক্তি কিয়ামতের ২ দিন আগে মারা গিয়েছেন আরেক ব্যক্তি কিয়ামতের ২ হাজার বছর আগে মারা গিয়েছেন। যিনি কিয়ামতের ২ দিন আগে মারা গিয়েছেন, তার পাপের পরিমাণ বেশি আর যিনি ২ হাজার বছর আগে মারা গিয়েছেন তার পাপের পরিমাণ কম। মুসলিমরা কবরের আযাবে বিশ্বাস করে। কবরের আযাব বলে যদি কিছু থেকেই থাকে, তাহলে যিনি কিয়ামতের ২ দিন আগে মারা গেলেন তার কবরের আযাব অনেক কম হবে; কারণ, তিনি অনেক কম সময় কবরে থাকছেন। পক্ষান্তরে, যিনি কিয়ামতের ২ হাজার বছর আগে মারা গেলেন তার কবরের আযাব অনেক বেশি হবে। কারণ, তিনি অনেক বেশি সময় কবরে থাকছেন। ফলে পাপ বেশি হওয়া সত্ত্বেও ১ম ব্যক্তি কম শাস্তি পেলেন এবং পাপ কম হওয়া সত্ত্বেও ২য় ব্যক্তি অনেক বেশি শাস্তি পেলেন। তাহলে আল্লাহ কী করে ন্যায়বিচারক হন?

উত্তর : কবরের আযাব বলতে ওই আযাবকে বোঝায়, যা মৃত্যুর পর থেকে শুরু হওয়া কবরের বা বারযাখের জীবনে মানুষ উপলব্ধি করে থাকে।

কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে, মানুষকে তার পাপ অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে এবং কারো প্রতি বিন্দুমাত্র জুলমও করা হবে না।

Scanned by CamScanner

.....

আজকের দিনে কারো প্রতি জুলম করা হবে না এবং তোমরা যা করবে কেবল তারই প্রতিদান পাবে।[১]

.....

.....

নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করেন না; আর যদি তা (মানুষের কর্ম) সৎকর্ম হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল সাওয়াব দান করেন।[২]

.....

.....

বস্তুত যারা মিথ্যা জেনেছে আমার আয়াতসমূকে এবং আখিরাতের সাক্ষাৎকে, তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমন বদলাই সে পাবে, যেমন আমল সে করত।[৩]

.....

অর্থাৎ, মানুষকে তার পাপের পরিমাণ অনুযায়ীই শাস্তি দেওয়া হবে। যে বেশি পাপ করবে, সে বেশি শাস্তি পাবে আর যে কম পাপ করবে, সে কম শাস্তি পাবে। এটাই সাধারণ নিয়ম।

ইমাম ইবনু কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহর মতে, কবরের আযাব ২ প্রকার—এক প্রকার হলো স্থায়ী এবং অপর প্রকার হলো সাময়িক।

স্থায়ী কবরের আযাবের উদাহরণ হচ্ছে—

.....

অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফিরআউন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল। সকাল ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে ফিরআউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল করো।[৪]

.....

---

[১] সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ৫৪

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ৪০

[৩] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৪৭

[৪] সুরা মুমিন, আয়াত : ৪৫-৪৬

Scanned by CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বপ্ন সম্পর্কিত একটি হাদিসে উল্লেখ আছে, 'তাদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত এ রকম শাস্তি চলতে থাকবে।'[১][২] অবিশ্বাসী বা কাফিরদের কবরের আযাব স্থায়ী হয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ আরও উল্লেখ করেছেন, কবরের সাময়িক আযাব হবে তাদের জন্য, যারা সাধারণ গুনাহগার বান্দা। ওই গুনাহের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তারা আযাব ভোগ করবে, তারপর তার আযাব বন্ধ হয়ে যাবে এবং সে রেহাই পেয়ে যাবে। কবরের এরূপ সাময়িক আযাব দুআ, সাদাকা, ক্ষমাপ্রার্থনা, হজ, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি নেক কাজের মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়।[৩] নির্দিষ্টকাল পরে এই আযাব বন্ধ হয়ে যায়।

এবার নাস্তিক-মুক্তমনাদের প্রশ্নের ব্যাপারে আসি। যে কাফিরদের স্থায়ী কবরের আযাব হবে, তাদের মৃত্যুর পর থেকে কবরের জীবনে শাস্তি শুরু হবে। কিয়ামতের আগে ও পরে—অনন্তকালব্যাপী তাদের শাস্তি চলতে থাকবে।[৪]

কিয়ামতের ২ দিন আগে কবর দেওয়া হোক আর ২ হাজার বছর আগে কবর দেওয়া হোক, এখানে সেটি বিবেচ্য বিষয় নয়। কারণ, তাদের শাস্তি চলবে অনন্তকাল বা অসীম (Infinity) সময় ধরে। এই অসীম সময়ের শাস্তির ক্ষেত্রে কারো আযাব আগে শুরু হোক বা পরে, মোট সময়ের পরিমাণ অসীমই থাকবে। একটি মহাসমুদ্রে ১ ফোঁটা পানি যোগ করলে তা যেমন মহাসমুদ্রে পানির পরিমাণের কোনোই পরিবর্তন ঘটায় না, তেমনি অসীম (Infinity) সময়ের শাস্তির জন্যও ২ হাজার কিংবা ২ লক্ষ বছর সময়ের ব্যবধানও শূন্যের সমান। কাজেই, সে যে সময়েই মারা যাক না কেন মোট শাস্তি সমান। [Infinity (∞)+ any number = Infinity (∞)]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৩৮৬

[২] *কিতাবুর রূহ* ['রূহের রহস্য' শিরোনামে বাংলায় অনূদিত], ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ, আহসান পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা : ১৬৭

[৩] *কিতাবুর রূহ*, ইমাম ইবনুল কাইয়িম, পৃষ্ঠা : ১৬৮

[৪] The people of Hell will abide therein forever, islamQa (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid) https : //islamqa.info/en/45804

Scanned by CamScanner

সাময়িক কবরের আযাব যাদের ওপর প্রযুক্ত হবে (অর্থাৎ পাপী মুসলিমরা), তাদের কবরের আযাব এক সময় থেমে যায়। কিয়ামতের ২ হাজার বছর আগে যার মৃত্যু হবে, গুনাহ কম হলে তার কবরের আযাবও কম হবে। গুনাহের পরিমাণ হিসেবে তা এক সময় থেমে যাবে। আগে মৃত্যুবরণ করার জন্য অতিরিক্ত কোনো শাস্তির ব্যাপার এখানে নেই। কিয়ামতের ২ দিন আগে মৃত্যুবরণ করলেও পাপের পরিমাণ অনুযায়ীই শাস্তি পাবে। পাপী মুসলিমরা তাদের পাপের পরিমাণ অনুযায়ী কবরে ও শেষ বিচারের দিন শাস্তি পাবে। পাপের শাস্তি শেষ হলে তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুত জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১] যদি কবরে সেই ব্যক্তির শাস্তি শেষ না-ও হয়ে থাকে, তাহলে (আল্লাহর বিশেষ ক্ষমা ও অনুগ্রহ না পেলে) শেষ বিচারের দিন তাকে অবশিষ্ট শাস্তি পেতে হবে। অর্থাৎ যতটুকু পাপ ততটুকুই শাস্তি। কারো প্রতি এতটুকুও অন্যায় করা হবে না। কবরের আযাব নির্ভর করে পাপের পরিমাণের ওপর; কবরের জীবনের সময়কালের ওপরে নয়।

নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্ম হিসাব গ্রহণকারী ও ন্যায়বিচারক।

> *সুতরাং, এরপরও কীসে তোমাকে কর্মফল দিবস সম্পর্কে অবিশ্বাসী করে তোলে? আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নন?*[২]

'...হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসিহ-দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।'[৩]

---

[১] The punishment in the grave may happen to sinners among those who affirm the Oneness of Allah; the squeezing in the grave will happen to everyone – islamQa (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https : //islamqa.info/en/175666

[২] সূরা তিন, আয়াত : ৭-৮

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ৫৮৮

Scanned by CamScanner

হিজড়াদের হত্যা করা!

উস্তায মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান

নাস্তিকদের অভিযোগ

সহিহুল বুখারি-র হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হিজড়াদের নির্বাসিত করতে হবে। নবিজি নিজেই তাদের ঘর থেকে বের করে দিতেন। শুধু তারা হিজড়া হয়ে জন্ম নিয়েছে, এই কারণে।

হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, নবি মুহাম্মাদ হিজড়াদের আসলে হত্যাই করতেন, শুধু মুসলিম নামাজি হিজড়ারা সালাত আদায় করার কারণে তাদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ, তারা আসলে হত্যারই যোগ্য, শুধু সালাত আদায়কারীদের আল্লাহ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন বলে নবি তাদের হত্যা করেননি।

নাস্তিকদের অভিযোগের জবাব

সহিহুল বুখারিতে এসেছে—

باب نفى أهل المعاصى والمخنثين

অধ্যায় : কবিরা গুনাহগার ও হিজড়াদেরকে দেশান্তর করা

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالَ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

Scanned by CamScanner

অর্থ : ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষ হিজড়াদের লানত (অভিশাপ) করেছেন। এবং বলেছেন, তাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুককে (হিজড়াকে) বের করে দেন ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তমুককে (হিজড়াকে) বের করে দেন।[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَا بَالُ هَذَا؟"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ

অর্থ : আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক হিজড়াকে আনা হলো, যার হাত-পায়ে মেহেদি লাগানো ছিল। লোকেরা বলল, সে মেয়েদের মতো সাজগোজ করে। এরপর তার ব্যাপারে দেশান্তরের নির্দেশ জারি করা হলো। সে 'নাকি' নামক স্থানে দেশান্তরিত হয়েছিল।[২]

এখন প্রশ্ন হলো : সব ধরনের হিজড়াদেরই কি দেশান্তর করা হবে কিংবা ঘর থেকে বের করে দেওয়া হবে? শুধু হিজড়া হওয়ার জন্যই কি তাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা হবে?

এর জবাব হলো—না।

আল্লামা তিবি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—

اَلْمُخَنَّثُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا مَنْ خُلِقَ كَذَلِكَ وَ لَمْ يَتَكَلَّفِ التَّخَلُّقَ بِأَخْلَاقِ النِّسَاءِ وَ زِيِّهِنَّ وَ كَلَامِهِنَّ وَ حَرَكَاتِهِنَّ هَذَا لَا ذَمَّ عَلَيْهِ وَ لَا إِثْمَ وَ لَا عَيْبَ وَ لَا عُقُوْبَةَ لِأَنَّهُ مَعْذُوْرٌ اَلثَّانِي مَنْ تَكَلَّفَ أَخْلَاقَ النِّسَاءِ وَ حَرَكَاتِهِنَّ وَ هَيَّاتِهِنَّ وَ كَلَامِهِنَّ وَ زِيِّهِنَّ فَهَذَا هُوَ الْمَذْمُوْمُ الَّذِيْ جَاءَ فِيْ الْحَدِيْثِ لَعْنُهُ

অর্থ : হিজড়া দুই ধরনের।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৫৮৮৬

[২] *ফাতহুল বারি*, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ১২; পৃষ্ঠা : ১৬০

Scanned by CamScanner

এক. যারা সেভাবেই জন্মেছে। তারা নারীদের মতো চরিত্র, সাজ-গোজ, কথা বলার ধরন বা চাল-চলন নকল করার কোনোরূপ চেষ্টা করে না (স্বাভাবিক আচরণ করে)। এসব হিজড়াদের কোনো ভর্ৎসনা, পাপ, দোষ কিংবা শাস্তি নেই। কারণ, তারা তো মাজুর।

দুই. যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নারীদের আখলাক, তাদের চালচলন, হাবভাব, কথা বলার ধরন এবং তাদের মতো সাজসজ্জা গ্রহণের চেষ্টা করে। এরাই হাদিসে বর্ণিত লানতপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি শুধু হিজড়া হয়ে জন্ম নেওয়ার জন্য কাউকে লানত বা অভিশাপ দিয়েছেন?

আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ হিজড়াদের বিধান-সংক্রান্ত হাদিসগুলোর ব্যাখ্যায় লিখেছেন—

فَمُخْتَصٌّ بِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَأَمَّا مَنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ فَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِتَكَلُّفِ تَرْكِهِ وَالْإِدْمَانِ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّدْرِيْجِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَتَمَادَى دَخَلَهُ الذَّمُّ وَلَا سِيْمَا أَنْ بَدَا مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِهِ

অর্থ : যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নারীদের মতো বেশভূষা ধারণ করে, তাদের জন্য এই লানত নির্ধারিত। আর যেসব পুরুষ সৃষ্টিগতভাবেই নারীদের মতো আচরণ করে, তাদেরকে এমনটা করতে নিষেধ করা হবে। তবে যেটুকু মাঝে মাঝে এসে যায়, তা থেকে তারা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে। কিন্তু সে যদি এই বিধান জানার পরও নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে থাকে, তাহলে সে-ও উক্ত লানতের মধ্যে পড়ে যাবে। বিশেষ করে, এ কাজের প্রতি খুশি থাকার কোনো আলামত যদি তার থেকে প্রকাশিত হয়।[২]

যদি দেশান্তর করলে ক্ষতি বা ঝামেলা হওয়ার ভয় থাকে, তবে তাদেরকে কিছুদিন নিরিবিলি কোনো এলাকায় রাখা হবে এবং তাদের এই অভ্যাস পরিবর্তনের চেষ্টা করবে।

---

[১] *শারহু মিশকাত*, তিবি, খণ্ড : ৯; পৃষ্ঠা : ২৯২৬; *মিরকাতুল মাফাতিহ*, খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ২৮১৯

[২] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ৩৩২

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন আসতে পারে, কিছু হিজড়া থেকে দূরত্ব অবলম্বন করা কিংবা তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার কারণ কী?

হাদিসে এসেছে—

عن أُمِّ سَلَمَةَ رضى الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدِى مُخَنَّثٌ، فَسَمِعَهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُمَيَّةَ يَا عَبْدَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ الطَّائِفَ غَدًا، فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلاَنَ، فَإِنَّهَا تَقْبِلُ بِأَرْبَعٍ، وَتَدْبِرُ بِثَمَانٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَدْخُلَنَّ هؤُلاَءِ عَلَيْكُنَّ

অর্থ : উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন আমার কাছে এক হিজড়া বসে ছিল। নবিজি দেখলেন সেই হিজড়া আব্দুল্লাহ ইবনু উমাইয়াকে বলছে, আব্দুল্লাহ, আগামীকাল যদি আল্লাহ তোমাদের তায়েফের বিজয় দান করেন, তবে তুমি গায়লানের কন্যাকে অবশ্যই অর্জন করবে। তার তো সামনে চার ভাঁজ আর পেছনে আট ভাঁজ পড়ে! (এখানে সেই নারীর শারীরিক সৌন্দর্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে সময় আরবরা মোটা নারীদের পরম আকাঙ্ক্ষিত মনে করত)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তার থেকে ফিতনার আশঙ্কা করে) বললেন, এরা যেন তোমাদের ঘরে প্রবেশ না করে।[১]

শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ হাফিযাহুল্লাহ এ বিধানের কারণ উল্লেখ করে বলেন, 'আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এসব হিজড়ার সংস্পর্শে থাকার কারণে অনেক পুরুষ মানুষও প্রভাবিত হয়ে মেয়েদের বেশভূষা ও সাদৃশ্য গ্রহণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। এমন ন্যক্কারজনক একটি কাজ সভ্য সমাজ ও জাতিগুলোকে আজ অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পুরুষরা নারীদের মতো কাপড় পরছে, তাদের চলন-বলন নকল করতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। এ ব্যাপারে যদি এখনই সতর্কতা অবলম্বন না করা হয়, তবে সামনে চরম বিপর্যয় নেমে আসবে।'[২]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪৩২৪, ৫৮৮৭

[২] http : //tiny.cc/51zgrz

Scanned by CamScanner

কিছু হিজড়াকে একঘরে করে রাখা কিংবা তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার কারণ হলো, তাদের থেকে ফিতনা সৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর যেসব হিজড়ার ক্ষেত্রে এই কারণ বিদ্যমান নেই অর্থাৎ যারা ইচ্ছাকৃতভাবে হিজড়া হয়নি এবং মেয়েদের সাদৃশ্য অবলম্বনের চেষ্টা করে না এবং যাদের থেকে নিশ্চিতভাবে কোনো ফিতনার আশংকা নেই তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজন নেই। সামনে এ ব্যাপারে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

হিজড়াদের কি হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে?

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, একদিন এক হিজড়াকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ধরে আনা হলো। সে হাতে-পায়ে মেহেদি ব্যবহার করত। নবিজি বললেন, এর এই অবস্থা কেন? বলা হলো, সে নারীর বেশ ধরেছে। নবিজি তখন তাকে আন-নাকি নামক স্থানে নির্বাসন দিতে আদেশ করলেন। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি তাকে হত্যা করব না? তিনি বললেন, সালাত আদায় করে এমন কাউকে হত্যা করা নিষেধ। আবু উসামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আন-নাকি হলো মদিনার প্রান্তবর্তী একটি জনপদ।[১]

এই হাদিসটি দেখিয়ে নাস্তিক-মুক্তমনারা দাবি করতে চায়, ইসলামে হিজড়াদের নাকি হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে! কেবল সালাত আদায়কারী হিজড়াদের হত্যা করা যাবে না।

এটা একটা ভিত্তিহীন দাবি। এমন দাবি করতে হলে, তাদেরকে অন্তত পক্ষে এমন একটা হাদিস দেখাতে হবে যেখানে বলা হয়েছে 'হিজড়াদের হত্যা করো!' এরপর কোন কারণ বা প্রেক্ষাপটে তা বলা হয়েছে, সেটা দেখাতে হবে। প্রমাণ করতে হবে, অন্য কোনো কারণ বাদে, কেবল হিজড়া হয়ে জন্মাবার জন্য কাউকে হত্যা করতে আদেশ করা হয়েছে। কেবল 'সালাত আদায় করে এমন কাউকে হত্যা করা নিষেধ' এই কথার দ্বারা মোটেও এটা প্রমাণিত হয় না যে, হিজড়াদের সাধারণভাবে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছে! কোনো ফিকহি গ্রন্থে এ হাদিস থেকে এমন বিধান পাওয়া যাবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিগণের থেকে এমন কোনো আমলও কেউ দেখাতে পারবে না।

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৯২৮

Scanned by CamScanner

হাদিসে 'সালাত আদায়কারীকে হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে' এই কথা বলার কারণ হলো, সাহাবিগণ জানতে চেয়েছিলেন, সেই হিজড়া ব্যক্তিটি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার মতো কোনো অপরাধ করাছে কি না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে সাধারণভাবে জানিয়েছেন যে, এই হিজড়া ব্যক্তিটি নামাজি। যা মুমিন হবার আলামত। এমন ব্যক্তির রক্তপাত সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। এর অর্থ মোটেও এই নয় যে, হিজড়াদের নির্বিচারে হত্যার বিধান দেওয়া হয়েছে।

আমরা ইতঃপূর্বেই আলোচনা করেছি, যেসব হিজড়া থেকে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে বিধান হলো, দূরত্ব বজায় রাখা কিংবা একঘরে করে রাখা; তবে হত্যা নয়। শুধু হিজড়া হওয়ার কারণে কাউকে হত্যা করা হয় না। কিন্তু সে যদি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অন্য কোনো অপরাধ করে থাকে, তা ভিন্ন বিষয়।

নাস্তিক-মুক্তমনারা *সহিহুল বুখারির* ব্যাখ্যাগ্রন্থ নাসরুল বারি থেকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে অনুচ্ছেদের নাম [৩৬১৩ অনুচ্ছেদ : গুনাহগার ও হিজড়াদের নির্বাসিত করা] দেখিয়ে দাবি করতে চায়, ইসলামে কেবল হিজড়া হওয়ার জন্যই নির্বাসনের বিধান দেওয়া হয়েছে।[১]

এর জবাবে আমরা বলব—এটি নাস্তিক-মুক্তমনাদের মারাত্মক ধরনের ভুল অনুধাবন। যেহেতু ফিতনার আশঙ্কায় কিছু বিশেষ ধরনের হিজড়াকে নির্বাসন দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে, এজন্য সাধারণভাবে নাসরুল বারির ওই অধ্যায়ে 'গুনাহগার ও হিজড়াদের নির্বাসিত করা' এই কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায়ের শিরোনামের মাঝে যেহেতু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না, কাজেই সাধারণভাবে ওই কথাটি লেখা হয়েছে। মুখান্নাছ বা হিজড়াদের বিশ্লেষণ নাসরুল বারির ৮নম্বর খণ্ডের ৩৯৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। অর্থাৎ, তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত বিধান সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা নাসরুল বারি গ্রন্থেরই ৮ম অধ্যায়ে হিজড়া-সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধানের মাঝে উল্লেখ পাই—

যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নারীদের সাদৃশ্য রয়েছে তাকে মুখান্নাস বলে। যেমন : কোমলতা-নমনীয়তা নারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যগুলো কখনো কখনো

---

[১] *সহজ নাসরুল বারি, শরহে সহিহুল বুখারি,* আল-কাউসার প্রকাশনী, খণ্ড : ১২; পৃষ্ঠা : ১৭৪ দ্রষ্টব্য

Scanned by CamScanner

পুরুষেরা জন্মগত ও স্বভাবগতভাবে পেয়ে থাকে। এটা দোষের কিছু নয়। কারণ, তার ওজর রয়েছে। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে শুরুর দিকে এ ব্যাপারে নিষেধও করা হয়নি।

কখনো কখনো অনেকে লোকদেখানোর জন্য নারীত্ব বরণ করে নেয়। এটা অবশ্যই নিন্দনীয়। যেমন: আজকাল যৌনাঙ্গ কেটে অথবা যৌনরগ পিষে কাপুরুষ হিজড়া বানানো হয়। কোনো কোনো রিওয়ায়েতে এ ধরনের লোকদের ওপরে লানত এসেছে। অতএব, মালউন বা অভিশপ্ত বলতে সেসব হিজড়াকে বোঝানো হয়েছে, যারা লৌকিকতার জন্য কৃত্রিমভাবে হিজড়ায় পরিণত হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দেখলেন, এ লোক তো যৌনাচার ও খাহিশাত সম্পর্কে বোঝে, তখন তিনি তাকে ঘরে ঢুকতে নিষেধ করে দেন এবং পর্দার হুকুম জারি করেন।'[১]

নাসরুল বারি গ্রন্থে *সহিহুল বুখারির* হাদিসটির এই বিস্তারিত ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট হলো যে, জন্মগতভাবে যারা হিজড়া, তারা মোটেও অপরাধী নয়। তারা নিন্দনীয় নয় এবং তাদের কোনো শাস্তিও নেই। নাসরুল বারির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যারা কৃত্রিমভাবে যৌনাঙ্গ বিকৃত করে হিজড়া হয়, তারা নিন্দনীয়; এদের ব্যাপারে অভিশাপের কথা বলা হয়েছে। আর যে হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন হিজড়াকে ঘরে ঢুকতে বারণ করেছেন, সেটি ছিল পর্দার কারণে। কেননা, সেই হিজড়া ব্যক্তিটি নারীদের রূপ-সৌন্দর্যের ব্যাপারে পুরুষদের মতো যৌন আকাঙ্ক্ষা বুঝত। এখানে কোথাও বলা হয়নি শুধু হিজড়া হওয়ার কারণেই কাউকে হত্যা করতে হবে।

প্রিয় পাঠক, লক্ষ করুন, যে *নাসরুল বারি* গ্রন্থে হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে, জন্মগতভাবে হিজড়া হওয়া কোনো অপরাধ নয়, সেই নাসরুল বারি গ্রন্থের একাংশ থেকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে কিছু কথা উল্লেখ করে নাস্তিক-মুক্তমনারা প্রমাণ করতে চায়, ইসলামে নাকি শুধু হিজড়া হয়ে জন্ম নেওয়ার কারণে ঘর থেকে বের করে দেওয়া ও নির্বাসনের আদেশ দেওয়া হয়েছে! প্রকৃত সত্যের সঙ্গে তাদের উপস্থাপিত তত্ত্বের পার্থক্য লক্ষ করুন।

---

[১] *নাসরুল বারি শরহে সহিহ আল-বুখারি*, আনোয়ার লাইব্রেরী, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৪২৭

Scanned by CamScanner

নাসরুল বারির এই ব্যাখ্যা থেকে এটিও পরিষ্কার হলো যে, শুধু হিজড়া হয়ে জন্ম নেওয়ার জন্য ইসলাম কাউকে হত্যার আদেশ দেয় না। কাজেই ইসলামের বিরুদ্ধে নাস্তিক-মুক্তমনাদের দাবিগুলো যে নিতান্তই অসার তা আবারও প্রমাণিত হলো।

Scanned by CamScanner

তবে কি বিজ্ঞান একাই লড়েছিল?

মুরসালিন নিলয়

মুসলিমদের একটি সাধারণ গুণ হলো, তারা যেকোনো বিষয় নিয়ে সাধারণের ঊর্ধ্বে গিয়ে বেশ ক্রিটিকাল চিন্তা করতে পারে। একটি চিন্তা যেসব উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তাতে কোনোমতেই গড়মিল করা যায় না।

আর এই গড়মিলগুলোকে যে জ্ঞান বা বিদ্যা ফিল্টার করে দেয়, তার একটি হলো যুক্তিবিদ্যা। এই বিদ্যা আমাদেরকে নানারকম লজিক্যাল ফ্যালাসিমুক্ত চিন্তা উপহার দিতে সক্ষম। ফ্যালাসি অনেক রকমের হতে পারে। তার মধ্যে আজ আমরা সংক্ষেপে ধারণামূলক অপযুক্তি বা Fallacy of Assumption সম্পর্কে জানব ইনশা আল্লাহ।

এই ফ্যালাসিযুক্ত বাক্যে সাধারণত এমন কিছুর উল্লেখ থাকে যা কিনা বক্তার ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

ধরা যাক, রিক্সায় উঠে আমি বৃদ্ধ চালককে বললাম, 'চাচা আপনার নাতি-পুতি কয়জন?'

শুনে স্বাভাবিক মনে হলেও এই প্রশ্নের আড়ালে লুকিয়ে আছে আমার কয়েকটি ধারণা। এমন প্রশ্ন করার অর্থ দাঁড়ায় কয়েকটি। সেগুলো হলো—

Scanned by CamScanner

» চাচা বিবাহিত।

» চাচার সন্তান রয়েছে।

» সন্তানের বিয়ে হয়েছে।

» সেই সন্তানের আবার সন্তান হয়েছে।

» তাই প্রশ্ন হলো, সেই সন্তান কয়জন।

তাহলে দেখুন, এখানে মূল প্রশ্নের আগে ৪টি প্রস্তাব ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন শুনে কতই না স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। অথচ, প্রশ্নটি পুরোপুরি আমার অনুমাননির্ভর। এখানে পুরো বাক্য একটি ভবনের মতো, যার শুরু ১ তলা আর শেষ হলো ৫ম তলা। যেকোনো একটি তলা ভুল প্রমাণিত হলে, সেটি সমেত এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সবগুলো তলাই ভেঙে পড়বে। যেমন—চাচা যদি বিয়েই না করে থাকে, তাহলে বাকি প্রস্তাবনাগুলোর আর কোনো অস্তিত্বই থাকে না। তাই সেগুলো খণ্ডনেরও প্রয়োজন নেই। এই হলো সহজ উদাহরণ। আশা করি পরিষ্কার হয়েছে বিষয়টি। তাহলে একটি পরীক্ষা হয়ে যাক? দেখি কেমন যুক্তিবিদ্যা শিখলেন আজ।

যেহেতু আমরা এখন শিক্ষাগ্রহণ করছি, তাই একটি ছড়া দিয়ে শুরু করা যাক—

‘যদি বেঁচে যাও এবারের মতো, যদি কেটে যায় মৃত্যুর ভয়,

জেনো বিজ্ঞান লড়েছিল একা, মন্দির-মসজিদ নয়।’

ভালোমতো খেয়াল করে দেখুন—‘বিজ্ঞান লড়েছিল একা, মন্দির-মসজিদ নয়।’ খুব চমৎকারভাবে এখানে ধারণামূলক অপযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে। কীভাবে? এবার ঢেলে সাজানো যাক।

উল্লিখিত ছড়ায় ব্যবহৃত ধারণাগুলো হচ্ছে—

[১] বিজ্ঞান অনেক কিছুর সাথে লড়াই করে। (যেমন : করোনার সাথে লড়ছে)

[২] মন্দির-মসজিদকেও লড়াইয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে। (তাই করোনার সাথে লড়াই করার কথা।)

Scanned by CamScanner

[২.১] (আক্ষরিক অর্থ বাদ দিলে) মানুষকে বাঁচানোর জন্য বিজ্ঞানের মতো ঔষধ আর চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের স্থান হলো ধর্মীয় প্রধান উপাসনালয়।

[৩] কিন্তু মন্দির-মসজিদ সেই লড়াই করছে না।

[৪] তাই বিজ্ঞান একাই লড়াই করে যাচ্ছে।

আসল প্রশ্নের আগে এখানে ৩টি প্রস্তাবনা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার দেখি সেগুলোর যথার্থতা কতখানি।

এখন, এই প্রস্তাবনার ১ম তলা ঠিক আছে। কিন্তু ২য় তলা ঠিক নয়। মসজিদের এ ধরনের ব্যবহার বর্তমানে প্রচলিত নয়। তাই ২য় তলাকে আমরা বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিতে পারি। ফলে ৩য় ও ৪র্থ তলা আপনা-আপনি ধসে পড়ল।

যে জিনিসকে যার জন্য তৈরিই করা হয়নি, সে জিনিসকে তার সাথে তুলনা করা কতখানি যৌক্তিক? ভবিষ্যতে যুদ্ধ বেধে গেলে কেউ যদি আমাদের বলে, 'যদি বেঁচে যাও এবারের মতো, যদি কেটে যায় মৃত্যুর ভয়, জেনো আর্মড ফোর্স লড়েছিল একা, স্মৃতিসৌধ নয়'। আচ্ছা, স্মৃতিসৌধের কাজ কি যুদ্ধ করা? সামরিক বাহিনী আর সৌধ নির্মাণের উদ্দেশ্য কি এক? চিন্তার এই ভ্রান্তিকে বলে ক্যাটাগরিকাল মিসটেইক।

ইসলামের ক্ষেত্রেও এই ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয়েছে শরিয়তের জ্ঞান না থাকার ফলে। ইসলামকে 'দ্বীন' মনে না করে অন্যান্য ধর্মের মতো শুধু একটি ধর্ম মনে করায় এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আর তাই, এ পর্যন্ত করা আলোচনাটুকু সকল ধর্মই তাদের নিজস্ব যুক্তি অনুযায়ী উপস্থাপন করতে পারবে; কিন্তু, এর বাকি অংশে কেবল এবং কেবলমাত্র ইসলামই প্রবেশ করতে সক্ষম।

ইসলামি শরিয়তে সাধারণভাবে মোরাল, সেরেমোনিয়াল, ফাংশনাল কোড-সহ বিভিন্ন বিধান রয়েছে; কিন্তু ওপরের ছড়ার মাঝে বিজ্ঞানের বিপরীতে শরিয়তের সব কোড বাদ দিয়ে শুধু সেরেমোনিয়ালকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যেখানে ইসলাম বলতে শুধু তাওবা, সালাত-সাদাকা, সকাল-সন্ধ্যার দুআ, রোগ ও অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার প্রার্থণা, আল্লাহর জিম্মায় থাকার আমল, নির্ধারিত যিকির-আযকার ইত্যাদিকে বোঝানো হয়।

Scanned by CamScanner

এদিকে ফাংশনাল কোডের মাঝে ব্যবহারিক আইন থাকে। তাই, এর মাঝে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও বিদ্যমান। যেমন, কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন, হাত ধোয়া, ইমিউনিটি বাড়ানোর বিভিন্ন পদ্ধতি, সুন্নাতি খাদ্যগ্রহণ, প্রতিষেধক নিয়ে গবেষণা ইত্যাদি।

প্রশ্ন আসতে পারে, যুক্তিবিদ্যার সেশনে লেখক আবার বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে ধর্মের নামে চালিয়ে দিচ্ছে না তো? ব্যাপারটি কিন্তু মোটেই তা নয়। যেখানে টেকনিকাল কোয়ারেন্টিনের সূচনা হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে আর রাষ্ট্রীয়ভাবে নীতি কার্যকর হয় ১৯২১ সালে এসে, সেখানে মহামারির সমাধান হিসেবে ইসলাম এগুলো মধ্যযুগেই কার্যকর করেছিল। এবার নীতিগুলো দেখে নেওয়া যাক—

» Lock Down : কোনো ভূখণ্ডে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার খবর শুনতে পেলে সেখানে প্রবেশ করা যাবে না। আর যদি তা নিজের আবাস পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে ওই স্থান পরিত্যাগ করা নিষেধ।[১]

» Isolation : রোগাক্রান্ত উটকে সুস্থ উটের সাথে একত্রে পানি পান করার স্থানে না আনা।[২]

» Quarantine : বাঘ থেকে মানুষ যেমন দূরে থাকে, কুষ্ঠ রোগী থেকে তেমনি দূরে থাকা।[৩]

তাহলে, প্রতিরোধ সেক্টর হলো এই ফাংশনাল কোডের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই, বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করতে হলে এই কোডের সাথেই করতে হবে। মসজিদকে টেনে এনে সেরেমোনিয়াল কোডে ঢুকে কুযুক্তি উৎপন্ন করলে তা গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

কাজেই, আলোচ্য ছড়াটি বিজ্ঞান এবং যুক্তির গণ্ডি ছেড়ে সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে চলে গিয়েছে। উল্টো এ ধরনের কথাবার্তা বিজ্ঞানের জন্য অসম্মানজনক। কারণ, শুরুতেই লিখেছে, 'যদি বেঁচে যাও এবারের মতো' মানে এবার বিজ্ঞান আছে বিধায় বেঁচে যাওয়া যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, যখন আধুনিক বিজ্ঞান

---

[১] দ্রষ্টব্য—*সহিহুল বুখারি* : ৫৭২৮

[২] দ্রষ্টব্য—*সুনানু আবি দাউদ* : ৩৯১১

[৩] দ্রষ্টব্য—*সহিহুল বুখারি* : ৫৭০৭

Scanned by CamScanner

ছিল না তখন মানুষের জন্য কে লড়াই করেছে? যেমন ১৪০০ বছর আগে? প্রাকৃতিক বিজ্ঞানহীন যুগ এলেও ওহির নির্দেশনাহীন যুগ কোনোকালেই আসেনি।

ভুল যেহেতু শুধরানোই হচ্ছে তাহলে আরেকটি ভুল শুধরে ক্লাস শেষ করে দিই—'কোনো ধর্মগ্রন্থে করোনা দমনের উপায় বলা থাকলে তা এখনই জানিয়ে দেন, ভ্যাক্সিন আবিষ্কারের পর গল্প বলে লাভ নেই।'

আচ্ছা বলুন তো, কথাটি আত্মসাংঘর্ষিক কি না? এই যে কৌশলগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো, এগুলো তো মহামারি দমনেরই কৌশল। নাকি শুধু ভ্যাক্সিন ছাড়া আর কিছু দিয়ে তা দমন করা যায় না? এ যুক্তিও তো বিজ্ঞানের সামনে টেকে না। যা এখনো পর্যন্ত আবিষ্কারই হয়নি, তা নিয়ে কথা বলছি! অথচ, এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ কৌশলের পুরোটাই যে ইসলামসম্মত—এটা কেন এড়িয়ে যাচ্ছি? এটা স্বীকার করে নিলে তো আর বিজ্ঞান মিথ্যে হয়ে যায় না। বিজ্ঞান তো কোনো সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র সম্পত্তি নয়। তাহলে, করোনা দমনের উপায় তো বলা হলোই, সেই সাথে কুযুক্তি ও অপবিজ্ঞান দমনের উপায়ও শেখা হলো।

এই সুযোগে আরেকটি হাদিস জেনে নেওয়া যাক—'তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো; কেননা, মহান আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার প্রতিষেধক তিনি সৃষ্টি করেননি।'[১]

তাহলে এই চিকিৎসাগ্রহণের দায়িত্ব কার? আর এই প্রতিষেধকটাই বা কে আবিষ্কার করবে? উপাদান আল্লাহ প্রকৃতিতে দিয়ে রেখেছেন। তাহলে হাদিসে বিশ্বাস করলে তো চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া সম্ভব যে করোনার প্রতিষেধক আছে এবং তা খুঁজে বের করা মানুষের দায়িত্ব ও পুরোপুরি ফরজে কিফায়া। অর্থাৎ, কেউ এই জ্ঞান অর্জন না করলে সবাই অপরাধী হবে। ওহি থেকে গাইডেন্স নিয়ে সেদিকে গাইডেড হওয়ার এই যে মূলনীতি, এটা বুঝলে কিন্তু অনেক উত্তর মিলে যাবে। এখন সৎভাবে উত্তর দিন, সমাধানের প্রতি গোটা জাতিকে অনুপ্রাণিত করছে কোন দ্বীন?

বুদ্ধিচর্চায় অগ্রগামী হওয়া আমাদের মুসলিম জাতির একটি বৈশিষ্ট্য। উপকারী ইলম অন্বেষণ করে মানবজাতির সেবা করা সম্ভব। আর সেবা মানেই আখিরাতে নিশ্চিত পুরস্কার। এই আখিরাতমুখী চিন্তাই মুসলিমদের সামনে সদা দুনিয়াবি সমৃদ্ধির পথ

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৮৫৫

Scanned by CamScanner

খুলে দিয়েছে। উম্মাহর কল্যাণের জন্য অতীতে মুসলিম জাতি অসংখ্য উপকারী বিদ্যা আবিষ্কার এবং তার চর্চা করেছে; কিন্তু আফসোস, যখন থেকে এ জাতি আখিরাত ভুলে গেছে, তারা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে দুনিয়াতেও আছড়ে পড়েছে।

বিজ্ঞানের উত্তর বিজ্ঞান দিয়ে দিতে হবে, দর্শনের উত্তরে দর্শন। আর এ সবই ইসলামের অংশ। ইসলাম শুধু ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম এটার অংশ মাত্র।

Scanned by CamScanner

স্রষ্টা থাকতে মানুষ কেন অনাহারে থাকে?

নাফিস শাহরিয়ার

'আর পৃথিবীতে বিচরণশীল সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর। আর তিনি তাদের অবস্থানস্থল ও সংরক্ষণস্থল জানেন। সবকিছুই সুস্পষ্ট এক কিতাবে রয়েছে।'[১]

নাস্তিক-মুক্তমনারা প্রায়ই কুরআনের এই আয়াত ব্যবহার করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, যেহেতু এত এত লোক অনাহারে আছে, তাই স্রষ্টা বলতে কিছু নেই! অথচ, আপনি যে দিব্যি আহার করেই এই ধরনের প্রশ্ন তুললেন এবং দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই যে প্রতিদিন খেতে পারছে—সেটা নিয়ে একবারও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন না!

প্রথমত, পৃথিবীতে কেউ যদি অনাহারে মারা যায়, তার মানে এই নয়, স্রষ্টা বলে কেউ নেই; বরং এর মানে হলো, আপনি স্রষ্টার উদ্দেশ্য এবং সব থেকে বড় কথা আপনার নিজের জীবনের উদ্দেশ্যই বুঝতে পারেননি। পৃথিবীতে কোনো সমস্যা থাকার মানে এই নয়, কোনো পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা নেই, বরং এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আপনি সৃষ্টিকর্তার সংজ্ঞা সম্পর্কে নিজে নিজেই কিছু একটা ধারণা করে নিয়েছেন, যা মোটেও সঠিক নয়।

---

[১] সূরা হুদ, আয়াত : ৬

Scanned by CamScanner

একটা পিঁপড়া যদি মানুষকে চ্যালেঞ্জ করে—'তোমাদের না এত বুদ্ধি? তাহলে তোমরা মাটির ওপরে বাড়ি বানাও কেন? আমাদের মতো মাটির নিচে থাকলেই তো পারো?' এখানে পিঁপড়া ধরে নিচ্ছে বুদ্ধিমান হলেই মাটির নিচে থাকতে হবে, যা হাস্যকর একটি যুক্তি। ঠিক একইভাবে, এটাও হাস্যকর যে, মানুষ সৃষ্টিকর্তার একটি সংজ্ঞা নিজে নিজে তৈরি করেছে এবং সেই সংজ্ঞা ব্যবহার করে নিজেরাই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে থাকে!

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীতে যদি কোনো সমস্যা না থাকত, কোনো অন্যায় না হতো, পৃথিবীতে যদি খারাপ কিছু না-ই থাকত, তাহলে আপনি বুঝতেন কী করে যে 'খারাপ' কোনটা আর 'ভালো' বলতেই বা কী বোঝানো হতো? করুণা করার প্রশ্ন তখনই আসে, যখন মন্দ কিছু ঘটে। কোনো মন্দ না থাকলে তো করুণার অস্তিত্ব থাকত না; বরং আপনার মনে করুণার ধারণাটি যে আছে সেটাই তো প্রমাণ করে, কেউ একজন আছেন, যিনি আপনাকে করুণার ধারণাটি দিয়েছেন! নাহলে এই ধারণাটি আপনার মনে এলো কী করে?

তৃতীয়ত, আল্লাহ পরম করুণাময় হলেই যে, তিনি কাউকে কোনো অন্যায় করতে দেবেন না, তা আপনাকে কে বলেছে? বাবা-মা তাদের সন্তানদের অত্যন্ত ভালোবাসেন; কিন্তু, ভালোবাসেন বলেই তারা নিশ্চয়ই তাদের বাচ্চাদের চিন্তার স্বাধীনতা কেড়ে নেন না এবং প্রত্যেকটি কাজে বাধা দেন না। বাচ্চারা অন্যায় করে, তারপর তার জন্য শাস্তিও পায়। বাচ্চারা যাতে ভুল না করে, সে ব্যাপারে বাবা-মা সর্বাত্মক সচেষ্ট থাকেন। সন্তানদেরকে অন্যায় থেকে দূরে রাখার জন্য পিতা-মাতা সবসময় উপদেশ দেন।

আমাদের মালিক আল্লাহও এটাই করেন আমাদের সাথে। (আল্লাহ তাআলা কখনোই বাবা-মা বা অন্য কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন। কেবল বোঝার সুবিধার্থে বাবা-মায়ের উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে।)

চতুর্থত, আপনি ধরে নিচ্ছেন, পৃথিবীতে যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের জন্য আল্লাহ তাআলা 'দোষী' (নাউযুবিল্লাহ)। এখানে মানুষের কোনো প্রকার হাত নেই। মানুষের হাত থাকলেও কেন আল্লাহ এমন ব্যবস্থা করলেন না যাতে করে মানুষ কখনো অন্য মানুষকে কষ্ট দিতে না পারে?

Scanned by CamScanner

এর ব্যাখা হলো—

আল্লাহ যে মানুষের তাকদির নির্ধারণ করেছেন এর বাইরে যাওয়ার সাধ্য মানুষের নেই তা যেমন সত্য, তেমনি আল্লাহ মানুষকে শ্রমনির্ভর করে তৈরি করেছেন সেটিও সত্য। আমরা সময় নিয়ে, সঠিকভাবে চিন্তা করে দেখি না অথচ আমরা আল্লাহকে দোষ দিই! যেমন ধরুন, আপনি হয়তো আফ্রিকার গরিব মানুষদের কষ্ট দেখে ভাবছেন, আল্লাহ কেন তাদেরকে এত কষ্ট দেন? আপনি সরাসরি ফলাফলের ওপর ফোকাস করেছেন। দুর্ভিক্ষের পেছনে বেশকিছু কারণ রয়েছে, সেদিকে দৃষ্টিপাত করাও কিন্তু জরুরি।

আল্লাহ আফ্রিকার দেশগুলোকে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়েছিলেন। তাদের তেল ছিল, হীরা ছিল, স্বর্ণ ছিল। খনিজ সম্পদে তারা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী একটি দেশ; কিন্তু এত প্রাচুর্যও তাদের বিপর্যয় ঠেকাতে পারেনি। তাদের সরকার নিজেদের পকেটে টাকা ঢোকাবার জন্য পশ্চিমা দেশের কোম্পানিগুলোর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সব তেল, গ্যাস, হীরা, সোনা পশ্চিমা দেশগুলোর হাতে তুলে দিয়েছে। যার ফলে আফ্রিকান কান্ট্রিগুলোর অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আর তারই ফল ভোগ করছে দেশের মানুষগুলো। দারিদ্র্যসীমার নিচে তো নেমে গেছেই, এমনকি না খেতে পেয়ে অনেকে মারাও যাচ্ছে।

আফ্রিকার গরিব দেশগুলোর সরকার যদি পররাষ্ট্র-নীতিতে স্বচ্ছ এবং দক্ষ হতো, তারা নিজেদের স্বার্থের কথা না ভেবে দেশের মানুষের জন্য ভাবত, প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত করত, তারা যদি নিজেদের দেশে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করে সেই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো নিজেরাই ভোগ করত, তাহলে আজকে তাদের এই অবস্থা হতো না। আল্লাহ সেই দেশগুলোকে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়েছিলেন, যেমনটি কিনা তিনি মালয়েশিয়াকে দিয়েছেন। মালয়েশিয়া তাদের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করেছে। নিজেদের সম্পদ নিজেরাই কাজে লাগিয়ে এর সুফল ভোগ করছে। তারা এখন অর্থনীতিতে বেশ সমৃদ্ধ একটি জাতি। অন্যদিকে আফ্রিকার দেশগুলো অল্প কমিশনের বিনিময়ে বিদেশি কোম্পানিগুলোকে নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে।[১]

---

[১] https : //en.wikipedia.org/wiki/Economic_history_of_Africa

Scanned by CamScanner

'আল্লাহ কখনো কোনো জাতির ওপরে দেওয়া তাঁর অনুগ্রহকে বদলান না, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেদের বদলে ফেলে।'[১]

এবার দয়া করে এই দাবি করবেন না যে, 'আল্লাহ কেন অলৌকিক কিছু করলেন না যাতে এরকম কিছু না হয়? আল্লাহ তো চাইলেই এখন অলৌকিকভাবে তাদেরকে খাবার পাঠাতে পারেন!'

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, এমন চিন্তা করা কতটা হাস্যকর। ধরে নিই, একদিন সোমালিয়াতে আকাশ থেকে খাবার পড়তে শুরু করল। এর ফলাফল কী হতে পারে ভাবুন তো! বিশ্বের সব মিডিয়া সেখানে জড়ো হবে, টুরিস্টরা ভিড় জমাবে। ঝাঁকে ঝাঁকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলো আসবে গবেষণা করতে। তারপর, ওই এলাকাকে তারা restricted area ঘোষণা করবে। মূলত যাদের সুবিধা পাওয়ার কথা, তারাই বঞ্চিত হবে। সবশেষে বিজ্ঞানীদের গবেষণায় উঠে আসবে, এলিয়েনদের খাবার পাঠানো থেকে শুরু করে আরও বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব! কারণ, প্রথম অধ্যায়েই আমরা দেখেছি যে, বিজ্ঞান কেবল জাগতিক ব্যাখ্যা দিতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এক ভাইয়ের একটা ঘটনা শেয়ার করি। তার সাথে আমার কথোপকথনের খণ্ডচিত্র তুলে ধরছি—

পরিচিত ভাই : ভাই, এগুলো সব বানানো। বাড়াবাড়ি করে দেখায় মানুষকে গলানোর জন্য।

আমি : না ভাই, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রিপোর্ট দেখেন, WFP রিপোর্ট দেখেন, উইকিপিডিয়া দেখেন। সবাই একই জিনিস বলছে। একসাথে সবাই প্রতারণা করতে পারে না।

তিনি অনেকক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখলেন—

পরিচিত ভাই : হুম, ঠিক কথাই তো মনে হচ্ছে। মানুষের অবস্থা তো সত্যিই খারাপ।

আমি : আসেন না, আমরা কিছু ডোনেট করি। চলেন, প্রতি মাসে মাত্র বিশ পাউন্ড হলেও ডোনেট করি। যেকোনো একটা চ্যারিটির ওয়েব সাইটে যান, পাঁচ মিনিটও লাগবে না।

---

[১] সূরা আনফাল, আয়াত : ৩

Scanned by CamScanner

তিনি : বিশ পাউন্ড তো অনেক! আগে পাঁচ পাউন্ড দিয়ে শুরু করি।

আমি : ভাই, আপনি আপনার পরিবার নিয়ে একবার সিনেমা দেখতে গেলেই বিশ পাউন্ড চলে যায়। আর আপনি মাসে একটা সিনেমার টাকা বাঁচিয়ে দশটা গরিব মানুষকে এক মাসের জন্য তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন না?

তিনি : আচ্ছা, আচ্ছা, আজকে রাতটা চিন্তা করে দেখি। বউয়ের সাথে কথা বলি আগে। কালকে আপনাকে জানাব।

আমি গভীর আগ্রহে রাত পার করি আগামীকালের জন্য। বড় আশা মনে, তাকে আগামী কালকে রাজি করাতে পারব ডোনেট করার জন্য।

তিনি : ভাই, রাতে অনেক চিন্তা করলাম। আমার অবস্থা বেশি ভালো না, ভাই। আমার মাস্টার্সের খরচ দিতে হচ্ছে। প্রত্যেক মাসে বাড়ির মর্টগেজ দিতে হয়। আমার ছেলেরা বড় হচ্ছে। দশ বছর পরেই ওদেরকে ইউনিভার্সিটিতে দেবো। অনেক পড়ার খরচ দিতে হবে। আর এই বছর দেশেও যাওয়া দরকার। যতটুকু পারি পাউন্ড জমানোর চেষ্টা করছি।

আমি : কী বলেন ভাই? আপনার মাসে মাত্র বিশ পাউন্ড দিলে এগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে!

তিনি : বলা তো যায় না। মাসে বিশ পাউন্ড মানে বোঝেন? বছরে আড়াই শ পাউন্ড। একজনের প্লেনের টিকেট হয়ে যায়।

আমি : একবার না বেড়িয়ে সেই টাকা দিয়ে দশটা মানুষের পুরো এক বছর তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারবেন না? দশটা মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। এতে আপনার কিছুই যায়-আসে না?

তিনি : আমার টাকাগুলো তাদের কাছে যাবে তার গ্যারান্টি কী? দেখবেন এর মধ্যে দশ পাউন্ড সব কর্মচারীর বেতন-যাতায়াত-খরচ হাবিজাবিতে খরচ হয়ে যাচ্ছে। এগুলো সবই ব্যবসা।

আমি : তাতে কী? সেটাও তো দরকার। না হলে এই টাকাগুলো গরিব লোকদের কাছে যাবে কী করে? আপনি-আমি তো নিজেরা প্লেনে করে আফ্রিকায় গিয়ে

Scanned by CamScanner

গরিবদের হাতে তুলে দেবো না। কাউকে তো যেতে হবেই নাকি?

তিনি : নাহ, আমার ঠিক মন টানছে না। মনে হচ্ছে, বিপদের জন্য টাকাগুলো রেখে দেওয়া দরকার। আপনার বাচ্চা হলে বুঝবেন, কত যন্ত্রণা জীবনে। ঈদে ওদেরকে জামা-কাপড় কিনে দিতে হবে। সে জন্য টাকা বাঁচাচ্ছি।

আমি : আপনার একটা প্যান্টের দাম কমপক্ষে বিশ পাউন্ড। এবার ঈদে একটা প্যান্ট না কিনে তিনটা মানুষকে বাঁচান?

তিনি : ঈদেও নতুন জামা-কাপড় কিনব না? বলেন কী! একই কাপড় পরে মানুষের বাসায় বেড়াতে যাব, লোকে কী বলবে?

আমি : আমি এই খয়েরি প্যান্টটা পরে গত দুমাস ধরে অফিস করছি। একবারও খেয়াল করেছেন সেটা? আমার কি মান-সম্মান চলে গেছে? বা ডিমোশোন হয়েছে? বা আমাকে অফিস থেকে বের করে দিয়েছে?

তিনি : সবাই এক না, ভাই। আপনি এক রকম, আমি আরেক রকম। আপনাকে পরিবার নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয় না, কিন্তু আমার অনেক দায়িত্ব।

আমি : ভাই, একটা বার চিন্তা করুন। আপনার বাচ্চা দুটো যদি তিন দিন খেতে না পেয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে আপনাকে বাবা পর্যন্ত ডাকতে না পারে, চুপ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপনার কোলে একসময় মারা যায়, তখন আপনার কেমন লাগবে?

তিনি : কী সব বাজে কথা বলছেন আপনি? আস্তাগফিরুল্লাহ!

আমি : ক্ষমা চাচ্ছি, ভাই। কিন্তু একটা বার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন। আপনার তো বাচ্চা আছে, আপনার বোঝা উচিত। আপনার কি মনে হয় না যে, চার হাজার বাচ্চা তাদের বাবা-মায়ের চোখের সামনে মারা যাবে, তাদের একজনকে হলেও আপনার বাঁচানো উচিত? মাত্র একজনকে?

তিনি : ভাই, আর কথা বলতে ভালো লাগছে না। এমনিতেই টাকা-পয়সার টানাটানি যাচ্ছে। ছেলে বড় হচ্ছে, বিয়ে করবে, তার জন্য আরেকটা বাড়ি কিনতে হবে। আগে নিজের পরিবার বাঁচাই, তারপর অন্যকে বাঁচাব।

Scanned by CamScanner

☆☆☆

তিনি চলে গেলেন। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, মানুষ এতটা পাষাণ হয় কীভাবে!

আপনি কি অস্বীকার করতে পারবেন, আমাদের অধিকাংশের মন-মানসিকতাই এমন? এরপরও কী করে স্রষ্টাকে দোষ দেন?

আপনি জানেন কি, অনেক দেশের সরকার তাদের কৃষকদের ভর্তুকি দেয় ফসল না ফলানোর জন্য এবং অতিরিক্ত ফসল নষ্ট করার জন্য? যাতে করে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে বেশি লাভ করা যায়। এর আবার একটা সুন্দর নামও আছে—Agricultural Adjustment Act.[১]

মানুষ যখন মানবতার চেয়ে নিজের পকেট ভারী করতেই বেশি ব্যস্ত, সে যে তখন ভারসাম্য হারাবেই!

FAO-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, পুরো পৃথিবীতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য রয়েছে; কিন্তু, তারপরেও কেন মানুষ অনাহারে থাকে? ক্ষুধায় ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়? এর প্রধান কারণ হলো দারিদ্র্য।[২]

আমাদের নিজেদের তৈরি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই ভারসাম্যহীনতার জন্য দায়ী।

এছাড়া FAO-এর আরও একটা রিপোর্ট বলে—প্রতিবছর গড়ে আমাদের খাবারের এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়, যা প্রায় ১.৩ বিলিয়ন টনের সমান। এই ক্ষতির পরিমাণ উন্নত দেশে ৬৮০ বিলিয়ন এবং ৩১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান।[৩]

তাছাড়া একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক ১৮০০ কিলোক্যালোরি যথেষ্ট, সেখানে আমেরিকাতে এর পরিমাণ মাথাপিছু ৩৭৫০![৪] এবার ভাবুন, কিছু লোক না খেয়ে থাকছে, অন্যদিকে কিছু লোক খাবার অপচয় করছে, ইচ্ছেমতো খেয়ে

---

[১] https : //en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_Adjustment_Act

[২] http: //www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/

[৩]http : //www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/

[৪] https : //en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_food_energy_intake

Scanned by CamScanner

তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছে আর স্রষ্টাকে দোষারোপ করছে!

আপনি যদি ভেবে থাকেন, আফ্রিকার দেশগুলোর জলবায়ুই দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছে, তাহলে ভুল ভাবছেন। একটি দেশে দুর্ভিক্ষের পেছনে শুধু প্রাকৃতিক কারণই কাজ করে না, এর পেছনে থাকতে পারে যুদ্ধের মতো অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দরিদ্রতা, যোগাযোগ-ব্যবস্থার সমস্যা-সহ আরও বহুবিধ কারণ। কারণগুলোর সবই আসলে মানবসৃষ্ট। খাদ্যসমস্যা নিয়ে আরও বিস্তারিত পড়তে পারেন World Hunger : Ten Myths বইতে।[১]

স্রষ্টা থাকার পরেও মানুষ কেন অনাহারে মারা যায়, এর উত্তর আল্লাহ কুরআনেই দিয়েছেন—'এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে।'[২]

আল্লাহ বলেই দিয়েছেন, তিনি আমাদের ক্ষুধা দিয়ে পরীক্ষা করবেন। এই পরীক্ষাটা শুধু যাকে 'ক্ষুধা' দেওয়া হয়েছে, তার জন্য নয়; বরং আমরা যারা এই 'ক্ষুধা'টা দেখছি, অনাহারীদের ক্ষুধা সম্পর্কে জানতে পারছি, তাদের জন্যেও এটা বিশাল একটা পরীক্ষা। স্রষ্টা কি আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ রাখতে বলেননি? স্রষ্টা কি আমাদের ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়াতে বলেননি? আপনি স্রষ্টার আইনকে ভঙ্গ করে আবার স্রষ্টাকেই দোষারোপ করেন কোন সাহসে!

সুরা হুদের ৬ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেক আলিম বলেন, এখানে রিজিকের দায়িত্বগ্রহণের অর্থ হবে আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া পর্যন্ত এক নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য আল্লাহ রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন। অর্থাৎ, যারা অনাহারে মারা যায়, তাদের আয়ু শেষ হয়ে যায়। ফলে রিজিক প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৩]

আপনি যদি মুসলিম হয়ে এই দাবি তোলেন যে, একজন শিশুর কী দোষ? তাহলে জেনে রাখা উচিৎ, স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী মৃত্যু দোষের কিছু না, বরং পৃথিবীকে শুরু থেকেই নশ্বরতা দিয়ে বানানো হয়েছে।

---

[১] https : //foodfirst.org/publication/world-hunger-ten-myths/

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫

[৩] *তাফসিরে মারিফুল কুরআন*, মুফতি শফি উসমানি, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৬৫২

Scanned by CamScanner

আপনাকে সুরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, 'আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবকিছু কেবলই তাঁর।' হতে পারে এতে কোনো হিকমাহ আছে, যা আমরা এখন বুঝতে পারছি না।[২][৩]

'এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিজিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন।'[৪]

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১৮৫

[২] https : //islamqa.info/en/13610

[৩] https : //islamqa.info/en/20785

[৪] সুরা ফজর, আয়াত : ১৬
http : //blog.omaralzabir.com/2012/09/11/why-did-allaah-do-this-part-2/

Scanned by CamScanner

অলৌকিক কিছু ঘটলে পরে...

নাফিস শাহরিয়ার

মহান আল্লাহ যুগে যুগে তাঁর অলৌকিকতা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন, যাতে মানুষ তাঁর দেখানো পথে ফিরে আসে। কিন্তু প্রতিটি যুগেই মানুষ তার সবচেয়ে মোক্ষম যুক্তি (?) দিয়ে সেই অলৌকিকতাকে ভুয়া প্রমাণের চেষ্টা করেছে। ১৪০০ বছর আগে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কার লোকদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তখন সবাই এই অলৌকিকতার সামনে অসহায়বোধ করত; কিন্তু এরপরেও তাদের অনেকেই কুরআনকে অলৌকিক হিসেবে বিশ্বাস করেনি, তাদের কাছে একটাই (অপ)ব্যাখ্যা ছিল—

'এটা জাদু ছাড়া আর কিছুই না।'

একই ঘটনা অন্যান্য নবির ক্ষেত্রেও ঘটেছে।

আমরা বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের যুগে বাস করি। তাই, সবকিছু বিজ্ঞান দিয়েই ব্যাখ্যা করতে ভালোবাসি। ধরুন, আপনি বন্ধুদের নিয়ে কক্সবাজারে বেড়াতে গেলেন এবং হঠাৎ আপনাদের মাথায় এই খেয়াল এলো, যদি এই অসম্ভব সুন্দর জায়গায় আল্লাহ তাআলা তাঁর কোনো নিদর্শন দেখান, তবে আপনারা সবাই বাকি জীবন তাঁর কথামতো চলবেন। আর ঠিক তখনই দেখতে পেলেন সমুদ্রের পানি দুভাগ হতে শুরু করেছে। সন্দেহ নেই, ঘটনার আকস্মিকতা আপনাদের অভিভূত করবে মক্কার সেই লোকগুলোর মতোই।

Scanned by CamScanner

কিন্তু, এরপরেই কী হবে জানেন? সবাই এই ঘটনার একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে উঠেপড়ে লাগবেন। মক্কার লোকগুলো উত্তর হিসেবে নিয়ে এসেছিল জাদু আর আপনারা নিয়ে আসবেন বিজ্ঞান। সব যুক্তি ব্যর্থ হলে 'প্রকৃতির হেঁয়ালিপনা' বলে চালিয়ে দেওয়ার নজির কিন্তু কম নয়। যেসব মানুষ তাদের চারপাশে শত অলৌকিকতা দেখেও তাদের হৃদয় অন্ধ রাখতে পারে, তাদের পক্ষে জলজ্যান্ত অলৌকিকতা দেখে ঈমান আনা বেশ কঠিনই। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন—

> যারা বিশ্বাস করে তারা জানে যে, এটাই তাদের রবের পক্ষ থেকে একমাত্র সত্য; কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে, তারা বলে, 'আল্লাহ এসব উদাহরণ দিয়ে আসলে কী বোঝাতে চান?' এভাবেই আল্লাহ তাআলা অনেককে পথ দেখান আর অনেককে পথভ্রষ্ট করেন। তিনি কেবল অবাধ্য ব্যক্তিদেরই পথভ্রষ্ট করেন।[১]

অলৌকিকতার সাথে সাথেই যে দুটো প্রশ্ন প্যারালালি চলে আসে, তা হলো আল্লাহকে দেখতে পেলে কিংবা তাঁর সাথে কথা বলতে পারলেই তো আমরা সবাই তাঁর ওপর ঈমান আনতাম!

সে ক্ষেত্রেও একই কথা আসে। যদি কোনো অবিশ্বাসী ব্যক্তি হঠাৎ কোনো গায়েবি আওয়াজ শোনে কিংবা আলোর ঝলকানি দেখে, তবে তা শোনা বা দেখামাত্রই সেটা স্রষ্টাপ্রদত্ত বলে বিশ্বাস করবে—এমন ধারণাও সঠিক নয়; বরং, অনেকেই তাকে মানসিক বিকারগ্রস্ত ভাবতে শুরু করবে আর সে নিজেও হয়তো কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজনবোধ করবে।

দ্বিতীয়ত, আপনি এমন বিশেষ কোনো মানুষ হয়ে যাননি যে, আপনাকে বিশ্বাস করানোর জন্য আল্লাহকে আপনার সাথে কথা বলতে হবে! আপনি আল্লাহর একজন সৃষ্টি মাত্র। আপনি ফেরারি গাড়ির শোরুমে গিয়ে যদি বলেন, 'আমি এই গাড়ি কিনবো না, যতক্ষণ না ফেরারি কোম্পানির CEO আমার সাথে দেখা করে বা আমার সাথে ফোনে কথা বলে'—তাহলে কি কোম্পানির মালিক আপনার সাথে দেখা করবে? অথবা আপনার সাথে কথা বলবে? নিশ্চয়ই না। সে-ও আপনার মতোই একজন মানুষ। কেবল সামাজিক মর্যাদা ভিন্ন হওয়ার কারণে সে আপনার সাথে কথা বলবে

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৬

Scanned by CamScanner

না। আর সবকিছুর স্রষ্টা, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর অস্তিত্ব বিশ্বাস করানোর জন্য আপনার সাথে কথা বলবে? How funny! গাড়ির কোম্পানির আপনার মতো দু-একজন মাথামোটা কাস্টমার না হলেও চলবে। কারণ, ভালো জিনিসের কাস্টমারের অভাব হয় না; বরং মাঝখান থেকে আপনি একটা ভালো গাড়ির মালিক হওয়া থেকে বঞ্চিত হলেন!

আপনি যদি ভেবে থাকেন, এই ধরনের অভিনব কথা নব্য নাস্তিকদের আবিষ্কার, তাহলে ভুল করছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও কাফিররা এরকম প্রশ্ন করত। পূর্বের নবি-রাসুলদেরও একই প্রশ্ন করা হয়েছিল। কুরআনে আল্লাহ তাআলা এর উত্তর দিয়েছেন—

> *যারা বোঝে না, তারা বলে, 'কেন আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলে না?' অথবা 'আমাদের কাছে কোনো অলৌকিক নিদর্শন আসে না কেন?' ওদের আগের প্রজন্মও একই কথা বলে গেছে। ওদের সবার অন্তর আসলে একই রকম। আমি অবশ্যই আমার নিদর্শনগুলো যথেষ্ট পরিষ্কার করে দিয়েছি সেইসব মানুষের কাছে, যারা নিশ্চিত হতে চায়।*[১]

এই মহাবিশ্বের বিশালতার তুলনায় আমাদের এই পৃথিবী বিশাল সমুদ্রে এক ফোঁটা পানির মতো। সেখানে আমরা তো ব্যাকটেরিয়া সমানও না। কোনো ধরনের Guideline ছাড়া আমাদের শাস্তি দেওয়াটা নিতান্তই অযৌক্তিক বলে আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হয়ে আমাদের জন্য একটা জীবনবিধান দিয়ে দিয়েছেন। আর আমরা এখানে তার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে উল্টো প্রশ্ন করি—কেন তিনি তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে আমাদের মতো VIP (!)-দের সাথে কথা বলেন না!

> *কোনো মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, ওহির মাধ্যম, পর্দার আড়াল অথবা কোনো দূত (ফেরেশতা)-প্রেরণ ছাড়া আল্লাহ সরাসরি তার সাথে কথা বলবেন।*[২]

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১১৮

[২] সুরা শুরা, আয়াত : ৫১

Scanned by CamScanner

ফিজিসিস্ট পল ডেভিয়েস বিষয়টা খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

'মনে করুন, 3D জগৎ থেকে একজন মেশিন-গানার 2D স্ক্রিনে গুলি করতে করতে ডান পাশ থেকে বাম পাশে যাচ্ছে যেন প্রতিটি গুলির দ্বারা তৈরি গর্তগুলোর দূরত্ব সমান হয়। এখন 2D জগতে বসবাসকারী বিজ্ঞানী জ্যামিতির দ্বারা লিমিটেড হওয়ায় মেশিন-গানারের সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে; কিন্তু সে গর্তগুলো ঠিকই দেখতে পাবে।

কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার পর সে বুঝতে পারবে, গর্তগুলো রেন্ডমলি সৃষ্টি হচ্ছে না, বরং একটা নিয়ম (সমান দূরত্ব) মেনে সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাতে Regularity-ও বিদ্যমান রয়েছে। এরপর এই বিষয়টাকে সে 'The Law Of Hole Creation' হিসেবে ব্যাখ্যা করবে।

অথচ, প্রতিটি গর্ত সৃষ্টি হচ্ছে মেশিন-গানারের কারণে। সে চাইলে যেকোনো সময়ই গর্তগুলোর দূরত্ব পরিবর্তন করতে পারে, আর সেটার কনভার্সন না হলে 2D-এর সায়েন্টিস্টের কাছে সেটা মিরাকল বলে আর্বিভূত হবে। কনভার্সন হলে সে তার Law দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারলেও বুঝতে পারবে না যে, এটা অটোমেটিক নয়।'[১]

কোনো কিছুর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য একেক যুগে একেকটা জিনিস মানদণ্ড ছিল। বিজ্ঞান নিজেই একটা মিরাকল। বিজ্ঞান কোনো কিছু invention করে না, discovery করে। যেমন: বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়মগুলো আবিষ্কার করেছে, কিন্তু শূন্য থেকে প্রকৃতিতে একটা নিয়মের প্রচলন ঘটাতে পারেনি। বিজ্ঞান ইচ্ছে করলেই $g=9.8\ m/s^2$ মানটিকে পরিবর্তন করতে পারবে না। তাই, এই Law-গুলোও মিরাকল। আর দুটো ম্যাগনেটের মাঝখানে একটা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, এটাই একটা মিরাকল। তবে কেবল তাদের জন্য, যারা চিন্তাশীল।

সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে—মহান আল্লাহ তাআলার অলঙ্ঘনীয় একটি নিয়ম আছে। সেটা হচ্ছে কাফিরদের দাবি অনুসারে অলৌকিকতা দেখানোর পরেও যদি কোনো জাতি কুফরিতে অটল থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের সমূলে ধ্বংস করে দেন।[২]

---

[১] *God and The New Physics*, Paul Davies

[২] এ নিয়মটা তখনই প্রযোজ্য হয়, যখন কাফিররা নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে আলৌকিক ঘটনা দেখার দাবি করে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের দাবি অনুসারে তা বাস্তবায়ন করে দেখান। সুতরাং দাবি অনুপাতে

Scanned by CamScanner

ঈসা আলাইহিস সালামের হাওয়ারিরা (সাহাবিগণ) যখন তার নিকট আসমান থেকে খাবার নিয়ে আসার কথা বলে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের এই বলে সাবধান করেন—

> *নিশ্চয় আমি সে (খাবারের) ঝুড়ি তোমাদের ওপর অবতীর্ণ করব। এরপরও যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ থাকবে, তাকে আমি এমন শাস্তি দেবো, যা বিশ্বজগতের আর কাউকে দেবো না।*[১]

চাহিদামতো নির্দিষ্ট মুজিজা দেখার পরও যদি কোনো জাতি ঈমান না আনে, তখন আল্লাহ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন। এজন্যই চাঁদ দিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর মক্কার কাফিররা ঈমান না আনা সত্ত্বেও তাদের ওপর আল্লাহর ব্যাপক আযাব আসেনি। কারণ, মক্কার কাফিররা নির্দিষ্টভাবে চাঁদ দিখণ্ডিত করে দেখানোর আবেদন করেনি, তারা চেয়েছিল যেকোনো একটি নিদর্শন দেখতে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দেখান। [*সহিহুল বুখারি* : ৩৬৩৭] কিন্তু তারা যখন নির্দিষ্টভাবে মক্কার সাফা পর্বতকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার আবেদন জানাল এবং মক্কার পাহাড়গুলো সরিয়ে সেখানে সুন্দর বাগ-বাগিচা ও নদনদী সৃষ্টির দাবি করল তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দুটি অপশন দিয়ে প্রত্যাদেশ পাঠানো হলো—**এক.** তাদের দাবি অনুসারে এগুলো বাস্তবায়ন করা হবে; কিন্তু এটার পর তাদের ইসলামগ্রহণ আবশ্যক হয়ে পড়বে, নয়তো তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। **দুই.** (পূর্ববর্তী উম্মতদের মতো মুজিযা দেখানোর পরও বিশেষ কোনো পরিবর্তন না আসায়) তাদের এসব মুজিযা দেখানো হবে না; বরং তাদের (দাওয়াতের মাধ্যমে) ইসলামগ্রহণের জন্য আরও অবকাশ দেওয়া হবে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদূরপ্রসারী বৃহৎ স্বার্থের কথা চিন্তা করে দ্বিতীয় অপশনটিই বেছে নিলেন। [*তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ২৫৭, ঈষৎ পরিমার্জিত]—শারয়ি নিরীক্ষক

[১] সুরা মায়িদা, আয়াত : ১১৫

Scanned by CamScanner

ইসলামে দাসীদের ব্যাপারে বিধান : অভিযোগ বনাম বাস্তবতা

মুহাম্মাদ সাদাত

ভূমিকা

ইসলামকে আক্রমণ করার যতগুলো মোক্ষম অস্ত্র ইসলামবিদ্বেষীদের হাতে রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই প্রোপাগান্ডা—ইসলাম ক্রীতদাসী ও যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে; এমনকি তাদেরকে যৌনদাসীতেও পরিণত করেছে। তাদের এই প্রোপাগান্ডায় যেকেউ ভেবে বসতে পারেন—ইসলামই বুঝি ক্রীতদাসী আর যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের প্রবর্তক। অথচ, বাস্তবতা হচ্ছে, ক্রীতদাসী আর যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে অতিপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসা যথেচ্ছ, অমানবিক ও অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচারকে ইসলাম সীমিত, মানবিক ও নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে এনেছে।

এছাড়াও তাদের জৈবিক চাহিদাপূরণের একটি বৈধ ও মর্যাদাপূর্ণ সুযোগ প্রদান করেছে, যার ফলে একদিক থেকে তাদের সন্তান জন্মগতভাবে স্বাধীন ও পিতার সম্পদের উত্তারাধিকারী হয়, অন্যদিক থেকে সন্তান গর্ভধারণের মাধ্যমে ক্রীতদাসীটি ক্রমান্বয়ে মুক্তি লাভ করে। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে কয়েকটি বিষয় আমাদের ভালোভাবে মনে রাখতে হবে—

Scanned by CamScanner

১ দাসপ্রথা ইসলাম উদ্ভাবিত কোনো বিষয় নয়, বরং দাসপ্রথা অতিপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসা একটি সামাজিক ব্যবস্থা। ইসলাম একদিকে সমাজে প্রচলিত অমানবিক দাসপ্রথাকে নিজ আওতার ভেতরে মানবিক করতে সচেষ্ট হয়েছে, অন্যদিকে বিভিন্ন উপায়ে দাসমুক্তকরণের পথ উন্মুক্ত করেছে।

২ ক্রীতদাসীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার দাসপ্রথার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; ইসলামের কোনো অপরিহার্য, অবশ্যকরণীয় অথবা আকাঙ্ক্ষিত বিষয় নয়। ইসলাম নিজ গণ্ডির ভেতরে এই বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করেছে মাত্র।

৩ দাসপ্রথার নিয়মকে ইসলামের সাথে গুলিয়ে ফেলার কোনোই সুযোগ নেই।

এক. যুদ্ধবন্দি বা যুদ্ধবন্দিনীর দাসত্ববরণ : একটি প্রচলিত পন্থা

১.১ যুদ্ধবন্দির দাসত্ববরণের প্রচলিত পন্থা ও ইসলামের অনুমোদন :

ইসলামি রাষ্ট্রনায়ক যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে নিম্নোক্ত যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন—

১.১.১ কতল করতে পারেন (এটি কেবল সেইসব যুদ্ধক্ষম পুরুষের জন্য প্রযোজ্য, যারা ইসলামি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে; নিরীহ ও সাধারণ নারী-শিশু-বৃদ্ধের জন্য প্রযোজ্য নয়।)

১.১.২ নিঃশর্তভাবে মুক্ত করে দিতে পারেন।

১.১.৩ মুক্তিপণ প্রদান সাপেক্ষে মুক্ত করে দিতে পারেন।

১.১.৪ যুদ্ধবন্দি-বিনিময় হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

১.১.৫ প্রচলিত অন্য কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারেন। যেমন : দাসপ্রথা প্রচলিত থাকলে তাদেরকে দাস/দাসী হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারেন।

সুতরাং, যুদ্ধবন্দিদের দাস-দাসী বানানো একটি প্রচলিত পন্থা ছিল, যা ইসলামের বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য কোনো নির্দেশ তো নয়ই, আকাঙ্ক্ষিত কোনো বিষয়ও নয়; বরং এটা অনেকগুলো অনুমোদিত পন্থার একটি। যদি ইসলামি রাষ্ট্রনায়ক

Scanned by CamScanner

কোনো কারণবশত পঞ্চম পন্থাটি অবলম্বন করেন, সেক্ষেত্রে বণ্টিত হওয়ার পর একজন যুদ্ধবন্দিনী ক্রীতদাসে পরিণত হবেন।

১.২ কেন এর অনুমোদন?

ইসলাম যদিও স্বাধীন ব্যক্তির বেচা-কেনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মাধ্যমে ক্রীতদাস প্রথার মূল উৎস বন্ধ করে দিয়েছে, দাসমুক্তির নানাবিধ পথ উন্মুক্ত করেছে, কিন্তু যুদ্ধবন্দিদেরকে ক্রীতদাস/ক্রীতদাসী বানানোর এই পথটি বন্ধ করেনি। প্রশ্ন আসতে পারে, কেন?

কারণগুলো আলোচনা করলেই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে :

১.২.১ ইসলাম একটি প্রায়োগিক ধর্ম। ইসলামের কোনো বিধানই বাস্তবতার পরিপন্থী নয়। কেউ আঘাত করলে প্রতিঘাত না করে তাকে আরো আঘাত করার সুযোগ করে দেওয়ার ধর্ম ইসলাম নয়। ইসলামে যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাস/ক্রীতদাসী বানানো জরুরি কোনো বিষয় না হলেও যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাস/ক্রীতদাসী বানানো তখনকার সময়ে একটি প্রচলিত নিয়ম ছিল। যুদ্ধে মুসলিমরা অমুসলিমদের হাতে বন্দি হলে তাদেরও একই পরিণতি বরণ করতে হতো। যতদিন পর্যন্ত মুসলিম যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাস/ক্রীতদাসী হওয়ার সম্ভাবনা দূর না হয়, ততদিন পর্যন্ত মুসলিমদের জন্য অমুসলিম যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাস/ক্রীতদাসী বানানোর সম-অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, নিজ অনুসারীদের নিশ্চিত বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেওয়ার মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ইসলাম কিছুতেই নিতে পারে না।

তবে ক্রীতদাস প্রথার এই উন্মুক্ত দ্বার বন্ধ করার চাবি অমুসলিমদের হাতেই ছিল। অমুসলিমদের হাতে সুযোগ ছিল মুসলিম যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাস/ক্রীতদাসী না বানানোর চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে ক্রীতদাস প্রথার উন্মুক্ত এই পথটি চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার।

১.২.২ মুক্তিপণ বা বন্দি-বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তকরণের পরও যে বিপুলসংখ্যক যুদ্ধবন্দি রয়ে যেত, তাদের নিঃশর্তভাবে মুক্ত করে দেওয়া ইসলামি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য যেমন হুমকিস্বরূপ ছিল, তেমনি কারাবন্দি করে রাখাও ছিল বেশ ব্যয়বহুল এবং অর্থনীতির ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টিকারী। সহজ উপায় ছিল—প্রচলিত নিয়মে ক্রীতদাস/ক্রীতদাসী হিসেবে তাদের বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া।

Scanned by CamScanner

১.২.৩ যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাস/ক্রীতদাসী হিসেবে বিভিন্ন পরিবারে বণ্টন করে দেওয়ার ফলে একদিকে যেমন সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকত, অন্যদিকে মনিবের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ করে ক্রীতদাস/ক্রীতদাসী নিজেদের মুক্ত করার সুযোগও পেত। অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে খুব কাছে থেকে ইসলামকে পর্যবেক্ষণ করে ইসলামে দাখিল হওয়ার একটি সুযোগও তাদের সামনে খোলা থাকত।

দুই. ক্রীতদাসী ও যুদ্ধবন্দিনী-সংক্রান্ত কিছু কুরআনের আয়াত

ক্রীতদাসী (ক্রয়কৃত/অধিকারলব্ধ দাসী বা বণ্টনকৃত যুদ্ধবন্দিনী)-দের জন্য কুরআনে ব্যবহৃত সাধারণ পরিভাষা হচ্ছে 'মা-মালাকাত আইমানুকুম' বা 'তোমাদের ডান হাতের মালিকাধীন/মালিকানাভুক্ত'। নিচে ক্রীতদাসী ও যুদ্ধবন্দিনী-সংক্রান্ত কিছু কুরআনের আয়াত বা আয়াতের প্রাসঙ্গিক অংশের অনুবাদ তুলে ধরা হলো—

আয়াতসূত্র-১ : কেবল মনিবের জন্য নিজ ক্রীতদাসীর সাথে দৈহিক সম্পর্কের অনুমোদন—

তবে তাদের স্ত্রী ও ডান হাতের মালিকানাভুক্তদের (দাসীদের) ক্ষেত্রে লজ্জা স্থানকে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না।[১]

আয়াতসূত্র-২ : বিবাহিত যুদ্ধবন্দিনীদের পূর্বেকার বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ধরা হবে[২]—

এবং (তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ) বিবাহিত নারী, তারা ব্যতীত যারা তোমাদের ডান হাতের মালিকাধীন।[৩]

আয়াতসূত্র-৩ : অন্যের ক্রীতদাসীকে মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহের অনুমোদন—

আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদের বিয়ে করবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা পরস্পর এক। অতএব, তাদেরকে

---

[১] সুরা মুমিনুন, আয়াত : ৬

[২] ওপরের বিধানটি স্বামী ছাড়া যেসব বিবাহিত নারী একাকী যুদ্ধবন্দিনী হয় তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্বামী-সহ বন্দি হলে বিবাহ অক্ষুণ্ণ থাকে।

[৩] সুরা মায়িদা, আয়াত : ২৪, প্রাসঙ্গিক অংশ

Scanned by CamScanner

তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে করো এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান করো এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে—ব্যভিচারিণী কিংবা উপপতি গ্রহণকারিণী হবে না।[১]

আয়াতসূত্র-৪ : দাসীদের বিবাহ প্রদানের নির্দেশ—

তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও।[২]

আয়াতসূত্র-৫ : দাসীদের পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা—

তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে, তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদের ব্যভিচারে বাধ্য করো না।[৩]

তিন. সংশ্লিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদিস, ফাতাওয়া ও আইন

সূত্র-১ (হাদিস)

আবু সায়িদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু আওতাসে ধৃত যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গর্ভবতী নারীর সাথে সহবাস করো না, যতক্ষণ না সে সন্তান প্রসব করে এবং যে নারী গর্ভবতী নয় তার সাথে (সহবাস) করো না, যতক্ষণ না তার একটি ঋতুচক্র সম্পন্ন হয়।[৪]

সূত্র-২ (হাদিস)

রুওয়াইফি ইবনু সাবিত আল-আনসারি থেকে বর্ণিত, নবিজিকে হুনাইনের দিনে যা বলতে শুনেছি আমি কি তোমাদের তা বলব না? তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়, অন্যের ফসলে পানি দেওয়া (অর্থাৎ

---

[১] সুরা মায়িদা, আয়াত : ২৫

[২] সুরা নূর, আয়াত : ৩২

[৩] সুরা নুর, আয়াত : ৩৩

[৪] *সুনানু আবি দাউদ* : ২১৫৭

Scanned by CamScanner

কোনো গর্ভবতী নারীর সাথে সহবাস করা)। এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়, কোনো যুদ্ধবন্দিনী নারীর সাথে সহবাস করা, যতক্ষণ না এটা প্রমাণিত হয় যে, সে গর্ভবতী নয়। এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়, বণ্টন হওয়ার আগে গণিমতের কোনো মাল বিক্রয় করা।'[১]

সূত্র-৩ (হাদিস)

হারুন ইবনুল আসিম বর্ণনা করেন, উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সৈন্যবাহিনী-সহ পাঠান এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যদল-সহ যিরার ইবনুল আজওয়ারকে পাঠান। যিরারের দলটি আসাদ গোত্রের একটি এলাকা দখল করে নেন এবং একজন সুন্দরী নারীকে বন্দি করেন। যিরার সেই নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান। তিনি তার সঙ্গীদের থেকে তাকে (সেই নারীকে) চাইলেন, তারা দিয়ে দিলো এবং তিনি তার সাথে সহবাস করলেন। উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পর কৃতকর্মের জন্য তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে বিস্তারিত সবকিছু বললেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু জানালেন, আমি অবশ্যই তোমার জন্য এর অনুমোদন ও বৈধতা প্রদান করছি। যিরার বললেন, 'না, উমারকে চিঠি না পাঠানো পর্যন্ত নয়।' উমার উত্তরে লিখলেন, তাকে রজম অর্থাৎ পাথরের আঘাতে হত্যা করতে হবে। কিন্তু চিঠি পৌঁছবার আগেই যিরার পাড়ি জমালেন না-ফেরার দেশে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহ যিরারকে অপমানিত করতে চাননি।'[২]

লক্ষ্যণীয়—

৩.৩.১ খলিফা বা খলিফা হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক বণ্টন হওয়ার আগে যুদ্ধবন্দিনীর সাথে সহবাস করা যে অবৈধ সেটা সকলেই জানত।

৩.৩.২ উক্ত কর্মটিকে ব্যভিচার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কেননা, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু এক্ষেত্রে শাস্তি হিসেবে ব্যভিচারের হদ[৩] নির্ধারণ করেছেন।

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ২১৫৮

[২] *আস-সুনানুল কুবরা,* বাইহাকি : ১৮২২২

[৩]জিনার শাস্তি অর্থাৎ বিবাহিত নারী-পুরষকে পাথরের আঘাতে হত্যা করা আর অবিবাহিত নারী-পুরুষকে ১০০টি বেত্রাঘাত করা।

Scanned by CamScanner

সূত্র-৪ (হাদিস)

আমর ইবনু সুহাইব তার পিতার বরাতে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন তার ক্রীতদাসের সাথে তার ক্রীতদাসীর বিয়ে দেবে, এরপর থেকে আর তার (ক্রীতদাসীর) সতরের দিকে তাকাবে না।[১]

সূত্র-৫ (ফাতওয়া)

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি কোনো পুরুষ তার মালিকানাধীন একজন ক্রীতদাসীর সাথে যৌনাচারে লিপ্ত থাকে এবং একই সাথে সে তার (ক্রীতদাসীর) বোনের সাথেও শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, উক্ত বোন পুরুষটির জন্য হালাল নয় যতক্ষণ না (প্রথমোক্ত) ক্রীতদাসীর সাথে তার সহবাস হারাম হয়ে যায়—বিবাহ, মুক্তকরণ, কিতাবা (মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি) অথবা অনুরূপ কোনো ঘটনার দ্বারা, কিংবা যদি সে তাকে (অর্থাৎ প্রথমোক্ত ক্রীতদাসীকে) তার ক্রীতদাসের সাথে অথবা অন্য কারো ক্রীতদাসের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়।[২]

সূত্র-৬ (হাদিস/ফাতওয়া)

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ ইয়াহইয়া ইবনু সায়িদ হতে এবং তিনি সায়িদ ইবনুল মুসাইয়াব রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, 'কোনো পুরুষ যখন কোনো নারীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে, তখন সে ওই নারীটির খালা বা ফুফুকে বিয়ে করতে পারবে না এবং অন্য কারো সন্তান গর্ভে রয়েছে এমন ক্রীতদাসীর সাথে কোনো পুরুষ সহবাস করতে পারবে না[৩]

সূত্র-৭ (ফাতাওয়া)

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মনিবের জন্য মালিকানা বলে খ্রিষ্টান ও ইহুদি

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ :* ৪১১৩

[২] *মুয়াত্তা মালিক* : ১৯৭৬

[৩] *মুয়াত্তা মালিক* : ১৯৪৮

Scanned by CamScanner

ক্রীতদাসী হালাল, কিন্তু মালিকানা বলে মাজুসি[১] (magian) ক্রীতদাসীর সাথে সহবাস হালাল নয়।'[২]

সূত্র-৮ (হাদিস)

নুমান ইবনু বশির থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে সহবাস করেছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এই খবর পৌঁছালে তিনি ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যদি স্ত্রী তার ক্রীতদাসীকে তার স্বামীর জন্য হালাল করে থাকে, তাহলে তাকে (স্বামীকে) একশোটি বেত্রাঘাত করা হবে। আর যদি স্ত্রী তার দাসীকে স্বামীর জন্য হালাল না করে থাকে, তাহলে আমি তাকে রজম করব।[৩]

সূত্র-৯ (আইন গ্রন্থ)

'When the army takes a woman captive followed by her husband who is also taken captive sooner or later and either the woman does not have menses during that period or has had upto three menses but she is not taken out of the Territory of War before her husband is taken, their marriage shall continue. Whosoever of the two is taken captive and brought to the Territory of Islam before the other, their marriage shall cease to exist'[৪]

সূত্র-১০ (হাদিস)

আবু মুসা আশয়ারি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তির কোনো ক্রীতদাসী আছে এবং সে তাকে শিক্ষা-দীক্ষা দেয়, তার সাথে সদ্ব্যবহার করে, এরপর তাকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করে নেয়, সে

---

[১] অগ্নি-উপাসক

[২] *মুয়াত্তা মালিক* : ১৯৮৩, ১৯৮৪

[৩] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৪৫৯

[৪] *Chapter II : The Army's Treatment of the Disbelievers*, passage 45, *The Shorter Book on Muslim International Law*, translated by Mahmood Ahmad Ghazi, মূল : *কিতাবুস সিয়ার আস সাগির*, লেখক : মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ শাইবানি

Scanned by CamScanner

দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে।' [১]

সূত্র-১১ (হাদিস)

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি শুনেছেন উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ছেলেকে একজন ক্রীতদাসী দান করে বলেন, 'তাকে স্পর্শ করো না, যেহেতু আমি তাকে উন্মোচন করেছি অর্থাৎ তার সাথে মিলিত হয়েছি।'[২]

সূত্র-১২

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তার (ক্রীতদাসীর) সন্তান তাকে মুক্ত করে, (অর্থাৎ মনিবের মৃত্যুর পরে), যদিও তা মৃত বাচ্চা হয়'[৩]

সূত্র-১৩

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যদি কোনো ক্রীতদাসী তাঁর মনিবের সন্তান গর্ভে ধারণ করে, তাহলে সে মনিবের মৃত্যুর পর স্বাধীন হয়ে যায়।'[৪]

সূত্র-১৪

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'উম্মুল ওয়ালাদ[৫]-কে বিক্রয় করা যাবে না।'[৬][৭]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৭২০

[২] *মুয়াত্তা মালিক* : ১৯৭৮

[৩] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ২১৪৭৮

[৪] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৭৫৯; *সুনানু দারাকুতনি* : ৪২৩৬

[৫] যে ক্রীতদাসী তার মনিবের সন্তান প্রসব করেছে।

[৬] *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ৪১৪৭

[৭] বস্তুত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে উম্মুল ওয়ালাদ বিক্রি নিষেধের ব্যাপারে কোনো হাদিস বর্ণিত হয়নি। এ মাসআলার মূল দলিল হলো—উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে সংঘটিত সাহাবিগণের ইজমা। বস্তুত ইসলামের প্রথম দিকে উম্মুল ওয়ালাদের বিক্রি বৈধ ছিল। পরে এটার বিধান রহিত হয়ে যায়; কিন্তু সবার কাছে রহিত হওয়ার বিধান না পৌঁছায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

Scanned by CamScanner

চার. ক্রীতদাসীর সাথে দৈহিক সম্পর্কের পন্থা

৪.১. বৈবাহিক পন্থা :

» নিজের ক্রীতদাসীকে বিয়ে করা : তার দাসত্বে থাকা অবস্থায় নিজে ক্রীতদাসীকে বিয়ে করা যায় না। কোনো মনিব যদি তার ক্রীতদাসীকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে তাকে মুক্ত করে বিয়ে করতে হবে। অর্থাৎ আগে তাকে স্বাধীন করতে হবে, এরপর স্বাধীন নারী হিসেবে তাকে বিয়ে করতে হবে। এই ধরনের বিয়েকে ইসলামে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।[১]

» অন্যের ক্রীতদাসীকে বিয়ে করা : অন্যের ক্রীতদাসীকে মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে করা যাবে।[২]

অবৈবাহিক বা উপবৈবাহিক পন্থা (concubinage) :

এই পন্থা নিয়ে নিচে বিস্তারিত আলোচনা আসছে। তার আগে আমরা উপপত্নী (concubine) এবং উপবৈবাহিক বন্ধন (concubinage) সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করব।

উপপত্নী ও উপবৈবাহিক বন্ধন

» উপবৈবাহিক বন্ধনের (concubinage) ইসলামপূর্ব প্রচলন[৩] কুরআন অবতরণের অনেক আগে থেকেই উপপত্নী গ্রহণ করা সামাজিকভাবে স্বীকৃত একটি বিষয় ছিল।

» প্রাচীন গ্রিসে উপপত্নী (গ্রিক 'pallakis') রাখার প্রচলনের কথা সামান্য লিপিবদ্ধ থাকলেও এথেনিয়ান ইতিহাসজুড়েই তা বিদ্যমান ছিল। hetaera-এর

সাল্লাম, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের কিছুদিন পর্যন্ত অজ্ঞতাবশত কিছু মানুষ উম্মুল ওয়ালাদদের বিক্রি করত। পরে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে খবর পৌঁছলে তিনি এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এরপর প্রায় সকল সাহাবিও তার মতের সাথে একাত্মতা পোষণ করেন। [*আওনুল মাবুদ* : ১০; পৃষ্ঠা : ৩৪৮-৩৫০, ঈষৎ পরিমার্জিত]

[১] দ্রষ্টব্য : সূত্র-১০

[২] দ্রষ্টব্য : আয়াতসূত্র-৩

[৩] উইকিপিডিয়া

Scanned by CamScanner

কিছু ব্যাখায় বলা হয়, তারা ছিল উপপত্নী, যাদের কোনো একজন পুরুষের সাথে স্থায়ী সম্পর্ক ছিল।

» প্রাচীন রোমে 'উপবিবাহ' ছিল একটি প্রচলিত প্রতিষ্ঠান—যা একজন পুরুষকে স্ত্রী ভিন্ন এমন একজন নারীর (concubina, বহুবচনে concubinae) সাথে একটি অলিখিত কিন্তু স্বীকৃত বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি প্রদান করে, যার নীচু সামাজিক মর্যাদা বিবাহের জন্য প্রতিবন্ধক ছিল। ধর্মীয় এবং পারিবারিক সংহতির জন্য হুমকিস্বরূপ না হওয়া পর্যন্ত 'উপবিবাহ' গ্রহণযোগ্য ছিল। 'concubina' বলে পরিচিত হওয়াকে অসম্মানজনক বলে বিবেচনা করা হতো না। কারণ, এমন উপাধি প্রায়ই সমাধিপ্রস্তরে খোদাই করা থাকত।

» প্রাচীন চীনে, সফল পুরুষরা প্রায়ই একাধিক উপপত্নী প্রতিপালন করতেন চৈনিক সম্রাটগণ রাখতেন হাজার হাজার উপপত্নী।

উপপত্নী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

» কোনো স্বাধীন নারীকে উপপত্নী হিসেবে গ্রহণের কোনো সুযোগই ইসলামে নেই।

» কিন্তু সমাজে দাসপ্রথা বিদ্যমান থাকলে নিজের ক্রীতদাসীকে উপপত্নী হিসেবে গ্রহণের অনুমতি ইসলামে রয়েছে (বণ্টনকৃত যুদ্ধবন্দিনীও ক্রীতদাসী হিসেবে পরিগণিত)। যে ক্রীতদাসীর সাথে তার মনিব শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে, সে অন্যান্য ক্রীতদাসী থেকে ভিন্ন হয়ে যায়। এ ধরনের ক্রীতদাসীকে বলা হয় সুররিয়্যাহ বা উপপত্নী। উপপত্নীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী পুরুষের বৈবাহিক কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয় না, কিন্তু সামাজিকভাবে স্বীকৃত এমন একটি বৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, ইসলাম যার অনুমতি প্রদান করে।

ইসলামে উপপত্নী ও স্ত্রীর সাদৃশ্য

ইসলামে উপপত্নী অনেক দিক দিয়েই স্ত্রীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উপপত্নী সংক্রান্ত অনেক বিধানই স্ত্রীর বিধানের সাথে মিল রেখে করা হয়েছে। নিচে কিছু সাদৃশ্য তুলে ধরা হলো—

Scanned by CamScanner

» নিজের স্ত্রীর জন্য যেমন স্বামী ভিন্ন অন্য কারো সাথে শারীরিক সম্পর্ক বৈধ নয়, তেমনি উপপত্নী ক্রীতদাসীর জন্য মনিব ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্ক বৈধ নয়। অর্থাৎ স্ত্রী এবং উপপত্নী উভয়েই একই সাথে কেবল একজন পুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক রাখতে পারবে।

» কোনো পুরুষ বিবাহ-বহির্ভূতভাবে কোনো স্বাধীন নারীর সাথে যেমন দৈহিক সম্পর্ক রাখতে পারে না, তেমনি নিজ মালিকাধীন ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্য কোনো নারীকে উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। এমনকি নিজ স্ত্রীর মালিকাধীন ক্রীতদাসীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনকেও ব্যভিচার হিসেবে গণ্য করা হয়।[১]

» একই সাথে দুই সহোদর বোনকে যেমন বিবাহ করা যায় না, তেমনি একই সাথে দুই সহোদর ক্রীতদাসীকে উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।[২]

» পিতার উপপত্নী ক্রীতদাসীর অবস্থান সন্তানদের জন্য নিজের মায়ের মতো। পিতার উপপত্নী ক্রীতদাসী পুত্রের জন্য ঠিক সেভাবেই হারাম, যেভাবে তার আপন মা তার জন্য হারাম।[৩]

» নিজ স্ত্রীর সন্তান যেমন বৈধ ও স্বীকৃত, তেমনি উপপত্নী ক্রীতদাসীর সন্তানও বৈধ এবং স্বীকৃত।

» উপপত্নী ক্রীতদাসীর সন্তান নিজের স্ত্রীর সন্তানের মতোই মুক্ত ও স্বাধীন সন্তান হিসেবে পরিগণিত হয়।

» উপপত্নী ক্রীতদাসীর সন্তান স্ত্রীর সন্তানদের মতোই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

---

[১] দ্রষ্টব্য : সূত্র-৮

[২] দ্রষ্টব্য : সূত্র-৫

[৩] দ্রষ্টব্য : সূত্র-১১

Scanned by CamScanner

পাঁচ. ক্রীতদাসী এবং যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে ইসলামি নিয়ন্ত্রণ

বণ্টন হওয়ার আগে কোনো যুদ্ধবন্দিনীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ

অনেকেই মনে করেন, যুদ্ধের ময়দানেই যেকোনো যুদ্ধবন্দিনীর সাথে যেকোনো মুসলিম যোদ্ধা ইচ্ছেমতো দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। ইসলামে এ ব্যাপারে কোনো বাধা-নিষেধ তো নেই-ই; বরং এটাই সম্ভবত ইসলামি নিয়ম। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একটা ধারণা। যুদ্ধক্ষেত্রে তো নয়-ই, এমনকি যুদ্ধ শেষ হলেও বণ্টন হওয়ার আগে কোনো যুদ্ধবন্দিনীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেউ এ ধরনের কোনো কাজে লিপ্ত হলে তা ব্যভিচার হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত ব্যক্তির ওপর ব্যভিচারের হদ প্রযুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যিরার ইবনুল আজওয়ার খলিফা/খলিফার পক্ষ হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক বণ্টনের আগেই একজন যুদ্ধবন্দিনীর সাথে সহবাস করার কারণে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ওপর ব্যভিচারের হদ প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১]

যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামী-সহ ধৃত যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ

বন্দি হওয়ার পর সাধারণভাবে বিবাহিত যুদ্ধবন্দিনীর পূর্বেকার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হিসেবে গণ্য করা হয়, ফলে তাদেরকে উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করা তথা তাদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ বলে বিবেচিত হয়।[২] কিন্তু যদি যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই একসাথে অথবা একজনকে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধির বাইরে নিয়ে যাওয়ার আগেই অন্যজন যুদ্ধবন্দি/বন্দিনী হিসেবে ধৃত হয়, সেক্ষেত্রে তাদের বিবাহ-বন্ধন অক্ষুণ্ণ থাকবে, ফলে উক্ত যুদ্ধবন্দিনীর সাথে স্বামী ভিন্ন অন্য কারো সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন অবৈধ হবে। তবে স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন যদি যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃত হয়ে মুসলিমদের শিবিরে পৌঁছে যায়, সেক্ষেত্রে তাদের বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হিসেবে গণ্য হবে।[৩]

---

[১] দ্রষ্টব্য : সূত্র-৩

[২] দ্রষ্টব্য : আয়াতসূত্র-২

[৩] দ্রষ্টব্য : সূত্র-৯

Scanned by CamScanner

ইদ্দতকাল অতিবাহিত হওয়ার আগে ক্রীতদাসী বা যুদ্ধবন্দিনীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ

ক্রীতদাসী ক্রয় করলেই কিংবা বণ্টনকৃত যুদ্ধবন্দিনী লাভ করার সাথে সাথেই একজন মুসলিমের জন্য তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন বৈধ হয়ে যায় না, বরং এক ইদ্দতকাল (তথা একটি পিরিওড বা মাসিক চক্র) অতিবাহিত হওয়ার আগে তাদের সাথে মিলিত হওয়া নিষিদ্ধ।[১][২]

প্রসবের আগে গর্ভবতী ক্রীতদাসী বা যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা—

ক্রয়কৃত ক্রীতদাসী বা বণ্টনকৃত যুদ্ধবন্দিনী যদি গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসবের আগে তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা নিষিদ্ধ।[৩]

বিবাহিত ক্রীতদাসীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা

যদি মনিবের অনুমতিক্রমে কোনো ক্রীতদাসী অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে মনিবের জন্য উক্ত ক্রীতদাসীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক তো নিষিদ্ধই, এমনকি সতরের দিকে দৃষ্টিপাত করাও হারাম হয়ে যায়।[৪]

যে ক্রীতদাসীর সাথে মনিবের দৈহিক সম্পর্ক রয়েছে তার বোনের সাথে মনিবের সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা

যদি আপন দুই বোন কোনো ব্যক্তির ক্রীতদাসী হিসেবে থাকে, মনিব কোনো একজনের সাথে দৈহিক সম্পর্কে জড়িত থাকা অবস্থায় অন্যজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না।[৫]

---

[১] এই নিয়ম সেসব ক্রীতদাসী/যুদ্ধবন্দিনীর জন্য যারা গর্ভবতী নন।

[২] দ্রষ্টব্য : সূত্র-২

[৩] দ্রষ্টব্য : সূত্র-১, সূত্র-২

[৪] দ্রষ্টব্য : সূত্র-৪

[৫] দ্রষ্টব্য : সূত্র-৫

Scanned by CamScanner

নিজ মালিকাধীন নয় এমন ক্রীতদাসীর সাথে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক নিষিদ্ধ

নিজের মালিকাধীন ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্য কারো ক্রীতদাসীর সাথে বিবাহ-বহির্ভূত দৈহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ (এমনকি নিজের স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথেও) এবং তা ব্যভিচার হিসেবে পরিগণিত হবে।[১]

ছয়. ক্রীতদাসীর সাথে মনিবের দৈহিক সম্পর্কের অনুমোদনের যৌক্তিকতা

[১] দ্রষ্টব্য : সূত্র-৮

Scanned by CamScanner

ক্রীতদাসীর জৈবিক চাহিদাপূরণ নিশ্চিতকরণ

ইসলামে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের যৌন-চাহিদার স্বীকৃতি রয়েছে এবং তা পূরণের বৈধ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একইভাবে ক্রীতদাস-দাসীদের যৌন-চাহিদা পূরণের বৈধ ব্যবস্থাও ইসলামে থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। ক্রীতদাসীকে পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত করার মতো ঘৃণ্য প্রথাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম নিজ ক্রীতদাসীকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে মুক্ত করে বিয়ে করতে উৎসাহিত করেছে; কিন্তু কোনো কারণে মনিব যদি ক্রীতদাসীকে মুক্ত করতে অপারগ হয়, সেক্ষেত্রে হয়তো তাকে নিজের সাথে জৈবিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখবে (উপপত্নী হিসেবে) অথবা অন্য কারো সাথে বিয়ে দিয়ে দেবে। অর্থাৎ, যেকোনো অবস্থায় ক্রীতাদাসীর জৈবিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে—'ক্রীতদাসীকে বিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই যেখানে তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব ছিল, সেখানে মনিবের জন্য ক্রীতাদাসীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার বহাল রাখার যৌক্তিকতা কী ছিল?' এ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো—

মনিবের সাথে দৈহিক সম্পর্ক অনুমোদনের যৌক্তিকতা

মনে রাখতে হবে—ইসলাম ক্রীতদাসীর সাথে মনিবের দৈহিক সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটায়নি, বরং দাসপ্রথায় যেখানে ক্রীতদাসী যৌনপণ্যের মতো যার ইচ্ছে তার উপভোগের সামগ্রী ছিল, ইসলাম সেটাকে শুধু একজন পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। সেই পুরুষটি হতে পারে তার মনিব অথবা মনিবের অনুমতিক্রমে বিয়ে করা তার স্বামী। একজন ক্রীতদাসীর জন্য অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করার চেয়ে নিজ মনিবের সাথে দৈহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুবিধা হচ্ছে—

সন্তানের মুক্তি—

» দাসপ্রথা অনুসারে একজন মনিবের ক্রীতদাসীর সন্তান (যে উক্ত মনিবের ঔরসজাত নয়, ক্রীতদাসীর স্বামীর সন্তান) উক্ত মনিবের ক্রীতদাস হিসেবে গণ্য হয়।

Scanned by CamScanner

» কিন্তু ক্রীতদাসীর সন্তান যদি মনিবের ঔরসজাত হয়, তবে সে উক্ত মনিবের সন্তান হিসেবে গণ্য হয়। ফলে সে সন্তান স্বাধীন ও পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।

ক্রীতদাসীর সামাজিক মর্যাদা ও মুক্তির সুযোগ—

আমরা আগেই দেখে এসেছি—ইসলামে মনিবের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনকারী ক্রীতদাসী তথা উপপত্নী অনেকটাই তার স্ত্রীর মতো। ইসলাম মনিবের সন্তানধারণকারী ক্রীতদাসীর সামাজিক মর্যাদাকে নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে তার মুক্তির একটি পথকেও উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

» ক্রীতদাসী মনিবের সন্তান গর্ভে ধারণ করার সাথে সাথে মনিবের জন্য সেই ক্রীতদাসীকে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ফলে উক্ত ক্রীতদাসী মনিবের পরিবারের স্থায়ী সদস্যে পরিণত হয়।[১]

» ক্রীতদাসী মনিবের সন্তান প্রসব করলে, (জীবিত অথবা মৃত) উক্ত ক্রীতদাসী 'উম্মুল ওয়ালাদ' বা 'সন্তানের মা' হিসেবে গণ্য হবে। সেই সন্তান মনিবের বৈধ, স্বাধীন সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এবং পিতার সম্পত্তির ঠিক সেভাবেই উত্তরাধিকার পাবে, যেভাবে তার স্ত্রীর সন্তানরা পেয়ে থাকে।

» মনিবের মৃত্যুর পর 'উম্মুল ওয়ালাদ' ক্রীতদাসী মুক্ত হয়ে যায়।[২]

কাজেই, দেখা যাচ্ছে ক্রীতদাসপ্রথায় ক্রীতদাসীর ওপর অনিয়ন্ত্রিত যে যৌনাচারের সুযোগ ছিল, ইসলাম সেটাকে নিয়ন্ত্রিত, মানবিক করে তুলেছে এবং প্রচলিত উপবৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, বৈধ ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে গিয়েছে—একদিকে যেমন ক্রীতদাসীর সন্তানকে স্বাধীন, বৈধ ও পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে, অন্যদিকে ক্রীতদাসীকে দিয়েছে একটি পারবারিক ঠিকানা ও মুক্তির পথ।

---

[১] সূত্র-১৪

[২] সূত্র-১২, সূত্র-১৩

Scanned by CamScanner

পরিশিষ্ট

সমালোচনা করাই যাদের লক্ষ্য, তারা সমালোচনা করবেই। কিন্তু, চিন্তা ও উপলব্ধির দ্বার এখনো যারা বন্ধ করেননি, আশা করি লেখাটি পড়ে স্পর্শকাতর এই বিষয়টি সম্পর্কে তাদের অনেক ভুল ধারণারই অবসান ঘটবে, ইনশা আল্লাহ।

Scanned by CamScanner

ভিন্ন কিরাআতে ভিন্ন কথা!

উস্তায মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান

সুরা বাকারার ১৮৩-১৮৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾
أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

.....

হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম (রোজা) ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।

.....

.....

নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তবে, তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদিয়া—একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা। অতএব, যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, সেটা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জেনে থাকো।

.....

Scanned by CamScanner

ইসলামবিরোধীদের অভিযোগ :

সর্বাধিক প্রচলিত হাফস কিরাআতে ১৮৪ নম্বর আয়াতে 'মিসকিন' (مسكين) শব্দটি একবচনে আছে। আবার ওয়ারশ, কালুন ইত্যাদি কিরাআতে বহুবচনে 'মাসাকিন' (مساكين) আছে। খ্রিষ্টান মিশনারি ও নাস্তিক-মুক্তমনাদের প্রশ্ন হচ্ছে—

'এভাবে ভিন্ন কিরাআতে ভিন্নভাবে শব্দটি এসেছে কেন? এতে কি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিধান পাওয়া যাচ্ছে না? লাওহে মাহফুজে তাহলে কুরআনের কোন বিধানটি লেখা রয়েছে?'

অভিযোগ খণ্ডন

এই আয়াতে আমরা একটা জিনিস লক্ষ করি, ১৮৪ নম্বর আয়াতে আমরা সচরাচর যে কিরাআত পড়ি, সেই হাফস কিরাআতে এটি পড়া হয়, فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ অর্থাৎ একজন মিসকিন বা দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা অর্থে।

সর্বাধিক প্রচলিত হাফস কিরাআতে এভাবে আছে। হাফস কিরাআত থেকে সংশ্লিষ্ট আয়াত—

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ
لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

পবিত্র কুরআন যেসকল কারি দ্বারা বর্ণিত, তাদের মধ্যে নাফি ও ইবনু আমির ব্যতীত সংখ্যাগরিষ্ঠ কারিগণ এভাবে 'মিসকিন' শব্দটি একবচন যোগে পড়েছেন।[১]

---

[১] *হুজ্জাতুল কিরাআত* : ১২৪; *তাকরিবুন নাশর* : ৯৬

Scanned by CamScanner

আর নাফি ও ইবনু আমির বহুবচন যোগে পড়েছেন, অর্থাৎ তারা পড়েছেন—

فدية طعام مساكين[১]

ওয়ারশ কিরাআতে এরূপে আছে। ওয়ারশ কিরাআত থেকে সংশ্লিষ্ট আয়াত—

এখন, একবচন ও বহুবচন আসার কারণে কুরআনের সমালোচকদের থেকে প্রশ্ন আসে—একবচন ও বহুবচন পড়ার কারণে কি হুকুমের মধ্যে কোনো পার্থক্য আসছে না? আর এভাবে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে পড়ার কারণই বা কী?

প্রথমত

এই আয়াতের হুকুম মানসুখ হয়ে গেছে অর্থাৎ রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু তিলাওয়াত অবশিষ্ট রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইচ্ছা করলে সিয়াম না রেখে ফিদিয়া দেওয়ার অর্থাৎ দরিদ্রকে খাদ্য খাওয়ানোর সুযোগ ছিল; কিন্তু পরে বিধান দেওয়া হয়, সিয়াম ফরজ হলে সামর্থ্য রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সিয়াম রাখতেই হবে। সিয়াম না রেখে শুধু ফিদিয়া দিলে হবে না।[২] তবে, কারো যদি রোজা রাখার সামর্থ্য না থাকে, সেক্ষেত্রে ফিদিয়া দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত

আয়াতে একবচন ও বহুবচন শব্দ দ্বারা এখানে প্রকৃতপক্ষে অর্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্দেশ করে না। কারণ, একবচন দ্বারা প্রতিদিনের হুকুম বর্ণনা করা

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] *সহিহুল বুখারি* : ১৯৪৯; *সহিহ মুসলিম* : ১১৪৫; *তাফসিরুত তাবারি*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৪১৮

Scanned by CamScanner

হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিদিন সিয়াম ভঙ্গ করবে, সে প্রতিদিন একজন করে মিসকিন বা দরিদ্রকে খাওয়াবে।

আর বহুবচন পড়তেও কোনো সমস্যা নেই। কেননা, তখন সারা মাসের হুকুম বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, সারা মাসব্যাপী যারা রোজা রাখবে না, তারা যেন সারা মাসই ফিদিয়া দেয় অর্থাৎ গরিবদেরকে খাওয়ায়। একটি মাস দ্বারা বহুসংখ্যক দিনকে নির্দেশ করা হয়। সে হিসেবে 'মাসাকিন' বহুবচন পড়লে অর্থের মধ্যে কোনো সমস্যা বা দ্বিমত তৈরি হয় না।[১]

এভাবে পড়ার একটি কারণ এ-ও হয় যে, অনেক ব্যক্তির মধ্যে এই ধারণা চলে আসে, সারা মাসে ফিদিয়া একজনকেই দিতে হবে, অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না; কিন্তু বহুবচন শব্দটি এই ধারণা দূর করে দেয়।[২]

যদিও দু-জায়গায় দু-রকম দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পড়া হচ্ছে; কিন্তু মূল জিনিস এখানে একই।

আরো একটা উদাহরণ দিই। তাহলে হয়তো আরেকটু সহজে বোঝা যাবে—ধরা যাক, একজন লোককে মাসে মোট ৩০ টি কলম দিতে হবে। প্রতিদিনের জন্য ১টি কলম। এই ব্যাপারটিকেই দু-জায়গায় দু-ভাবে বলা হলো।

১. You will give me ONE PEN for each day in that month.

২. You will give me 30 PENS in that month.

এখানে এক জায়গায় Pen-এর একবচন, আবার অন্য জায়গায় বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু মূল অর্থ একই।

এখন, একটি প্রশ্ন আসতে পারে—আল্লাহ যে কুরআন নাযিল করেছিলেন, তাতে কি এই দুই রকমের শব্দ ছিল?

---

[১] *হুজ্জাতুল কিরাআত* : ১২৪-১২৫; *আল-কিরাআতুল মুতায়াতিরাহ ওয়া আসারুহা ফি রসমিল কুরআনি ওয়া আহকামিশ শারয়ি* : ২৬৫-২৬৬

[২] *আল-কিরাআতুল মুতায়াতিরাহ ওয়া আসারুহা ফি রসমিল কুরআনি ওয়া আহকামিশ শারয়ি* : ২৬৫-২৬৬

Scanned by CamScanner

একটি কথা আমাদের ভালোমতো বুঝতে হবে। আগের যুগে নবিগণ কোনো একটি বিশেষ গোত্র বা এলাকার জন্য নির্দিষ্ট ছিলেন। তাই তাদের এক ধরনের শব্দ পড়তে কোনো অসুবিধা হতো না, যেহেতু তারা সেই গোত্রেরই ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ সমস্ত ভাষা-ভাষী, গোত্র ও রাষ্ট্রের জন্য নবি করে পাঠিয়েছেন। তিনি হলেন বিশ্বনবি। তাই, কুরআন প্রথমে কুরাইশি পদ্ধতিতে নাযিল হলেও পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবেদনের কারণে আরও কিছু পদ্ধতিতে কুরআন নাযিল করা হয় এবং সেসব পদ্ধতিতে তিলাওয়াতের অনুমতি দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী সাহাবিগণের দ্বারা সেই প্রথম কুরাইশি পদ্ধতিকে একটি পাণ্ডুলিপিতে আনা হয়। যেমন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

“

أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

জিবরিল আলাইহিস সালাম আমাকে এক হারফে (কুরআন) পড়ালেন। আমি তার সাথে আলোচনা করলাম এবং বারবার বৃদ্ধি করার কথা বললাম, তিনি (আল্লাহর কাছে থেকে বৃদ্ধি করিয়ে) আমার কাছে ৭ হারফ পর্যন্ত বৃদ্ধি করলেন।[১]

“

وعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ. فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ. فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ. فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪৪৯১; *সহিহ মুসলিম* : ৮১৯

Scanned by CamScanner

ইমাম মুসলিম, উবাই ইবনু কাব থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গিফার গোত্রের কূপের নিকট ছিলেন। তখন জিবরিল আলাইহিস সালাম তার নিকট এসে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার জাতিকে এক হারফে কুরআন পড়ান। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নিকট তাঁর ক্ষমা এবং উদারতা প্রার্থনা করি। নিশ্চয়ই আমার জাতি এতে সমর্থ হবে না। তিনি পুনর্বার তার নিকট এসে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার জাতিকে দুই হারফে কুরআন পড়ান। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নিকট তাঁর উদারতা ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিশ্চয়ই আমার জাতি এতে সমর্থ হবে না। জিবরিল আলাইহিস সালাম তৃতীয়বার এসে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার জাতিকে তিন হারফে কুরআন পড়ান। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমার জাতি এতে সমর্থ হবে না। আমি তাঁর উদারতা ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। জিবরিল আলাইহিস সালাম চতুর্থ বার তার নিকট এসে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার জাতিকে সাত হারফে (পদ্ধতিতে) কুরআন শিক্ষা দেন। তারা এর যেকোনো পদ্ধতিতে পাঠ করলে তা যথার্থ হবে।[১]

মনে রাখার মতো জরুরি কিছু কথা—

» এই সামান্য কিছু শব্দের ভিন্নতা, অর্থের মৌলিক বিষয়ের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ বা মতানৈক্য সৃষ্টি করেনি। মূল অর্থ একই রয়েছে।

» এখানে পার্থক্য কেবল কিরাআত বা পঠনরীতিতে; লিখিতরূপে নয়। আদি আরবি ভাষায় নুকতা, যবর, যের, পেশ, তাশদিদ বা তানবিন ছিল না। কাজেই বিভিন্নভাবে কিরাআত বা পঠনের সুযোগ থেকে যায়। তাই আমরা যখন দেখি مسكين শব্দটি নুনের নুকতা এবং যবর, যের, পেশ ছাড়া তখন مساكين পড়ারও সুযোগ থাকে। কারণ, مسكين শব্দের মাঝে খাড়া যবর দিলে مساكين হয়ে যায়। এখানে মূলত অতিরিক্ত কোনো অক্ষর নেই। খাড়া যবরের জন্য আলিফ দেওয়া হয়েছে। আলিফ ব্যতীত শুধু খাড়া যবর দিয়েও এটি লেখা হয়। আদি অবস্থায় যবর, যের, পেশ ব্যতীত লিখিত রূপ একই থাকে। আর লাওহে মাহফুজে সেই আদি অবস্থাতেই কুরআন রয়েছে।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৮২১

Scanned by CamScanner

» সব শব্দে এবং সব আয়াতে যে এই ভিন্নতা রয়েছে, তা কিন্তু নয়; বরং এই ভিন্নতা সামান্য কিছু আয়াতে, সামান্য কিছু শব্দে আছে মাত্র। অধিকাংশ আয়াতের মধ্যে মূল পাঠের আদৌ কোনো ভিন্নতা নেই।

» এগুলো প্রথমে উম্মতের সহজতার জন্য করা হয়েছিল।

অতএব, কুরআনের ভিন্ন কিরাআতগুলোতে ভিন্ন কোনো তথ্য দেওয়া নেই। তা একই কুরআনের ভিন্ন পঠনের রীতি মাত্র, যা দ্বারা মূল অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

Scanned by CamScanner

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র

জাকারিয়া মাসুদ

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত্র। অতএব, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারো।[১]

নাস্তিকদের বেশিরভাগই এই আয়াতটির মনগড়া কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। হুমায়ুন আজাদও সেটার ব্যতিক্রম করেননি। তিনি এই আয়াতটি ব্যবহার করে বোঝাতে চেয়েছেন, ইসলাম পুরুষকে নারীজাতির প্রতি স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছে। নারীকে বানিয়েছে পুরুষের জমি। তিনি বলেন—

'সব ধর্মেই নারী অশুভ, দূষিত, কামদানবী। নারীর কাজ নিষ্পাপ স্বর্গীয় পুরুষদের পাপবিদ্ধ করা; এবং সব ধর্মেই নারী সম্পূর্ণ মানুষ। নারী কামকূপ, তবে সব ধর্মই নির্দেশ দিয়েছে যে নারী নিজে কাম উপভোগ করবে না, রেখে দেবে পুরুষের জন্যে; সে নিজের রন্ধ্রটি একটি অক্ষত টাটকা সতীচ্ছেদে মুড়ে তুলে দেবে পুরুষের হাতে। পুরুষ সেটি ইচ্ছামতো ভোগ করবে, নিজের জমি যেভাবে ইচ্ছে চষে বেড়াবে। ইসলাম নারী সম্পর্কে এ-ধারণাই পোষণ করে।'[২]

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৩

[২] *নারী*, হুমায়ুন আজাদ, পৃষ্ঠা : ৮২

Scanned by CamScanner

ওপরের আয়াতটি এখানেই শেষ নয়, এর পরেও কিছু অংশ রয়েছে। আয়াতটির বাকি অংশ হলো—

وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

.....

তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্যে কিছু করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। আর জেনে রেখো, আল্লাহর সাথে তোমাদের অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে। আর আপনি মুমিনদের সুসংবাদ দিন।[১]

.....

আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে কী অর্থ নির্দেশ করে?

এই আয়াতটি কি সত্যি তা-ই বোঝায়, যা নাস্তিকরা ভাবে? প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে, কুরআনুল কারিম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর একদিনে নাযিল হয়নি। সময়ের সাথে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান জানিয়ে ধাপে ধাপে কুরআন নাযিল হয়েছে। যেমন ধরে নিই, সাহাবিগণ যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন, তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

.....

আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয়ই আমি রয়েছি সন্নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।[২]

.....

আবার সাহাবিগণ যখন মদ ও মাদকদ্রব্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে—

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৩

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৬

Scanned by CamScanner

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

.....

তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, দুটোর মধ্যেই আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্যে উপকার। তবে এ দুটোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? বলুন, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করো।[১]

.....

ইহুদিরা যখন রুহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চেয়েছে, তখন আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে রুহ সম্পর্কে অবহিত করেছেন—

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

.....

তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, রুহ আমার পালনকর্তার আদেশঘটিত। আর এ বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।[২]

.....

এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন সুরা নাযিল হতে থাকে। নবিজির ২৩ বছরের নবুওয়াতের জীবনে কখনো একটি আয়াতের কিছু অংশ, কখনো পূর্ণ একটি আয়াত, কখনো একাধিক আয়াত, আবার কখনো সম্পূর্ণ একটি সুরা ওহি আকারে নাযিল হয়। ফলে এক-একটি আয়াত অথবা এক-একটি সুরা নাযিলের পেছনে রয়েছে আলাদা আলাদা প্রেক্ষাপট। তাই কেউ যদি কোনো আয়াত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই সেই আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট জানতে হবে।

‘তাদের নিকটবর্তী হয়ো না’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৯

[২] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৮৫

Scanned by CamScanner

আমাদের আলোচনা যেহেতু 'সুরা বাকারা'র ২২৩ নম্বর আয়াত নিয়ে, তাই আমরা আয়াতটির শানে নুযুল জানার চেষ্টা করব। ইনশা আল্লাহ, আয়াতটির শানে নুজুল জানলেই আজাদের দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হবে। তবে আয়াতটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে হলে, এর আগের আয়াত নিয়েও একটু আলোচনা করতে হবে। কেননা, পূর্বের আয়াতটি (২২২) এই আয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

আর তারা আপনাকে ঋতু সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলে দিন, তা কষ্টকর। অতএব, তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর তারা যখন পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা ভালোভাবে পাক-পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালোবাসেন।[১]

আমাদের আলোচনা হবে ২২২ নম্বর আয়াতের শেষাংশ হতে ২২৩ নম্বর আয়াতের সমাপ্তি পর্যন্ত। এখান থেকে—...অতএব, তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর তারা যখন পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা ভালোভাবে পাক-পবিত্র থাকে, তাদেরকেও ভালোবাসেন। তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত্র। অতএব, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারো। তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্যে কিছু করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। আর জেনে রেখো, আল্লাহর সাথে তোমাদের অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে। আর আপনি মুমিনদের সুসংবাদ দেন।'—এই পর্যন্ত।

আল্লাহ তাআলা ২২২ নম্বর আয়াতে নারীদের ঋতুকালীন অবস্থার বিধান বর্ণনা করেছেন। তিনি এই সময়ে স্বামী-স্ত্রীর সহবাস হারাম করেছেন। স্ত্রী যখন মাসিক

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২২

Scanned by CamScanner

থেকে পবিত্র হয়ে যাবে, তখন স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে ঠিক সেভাবে, যেভাবে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। কীভাবে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন—এই ব্যাপারে মুফাসসিরদের কয়েকটি মতামত আপনাদের সামনে তুলে ধরছি—

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেন, 'এর অর্থ হচ্ছে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে এবং মলদ্বার থেকে দূরে থাকবে।'

ইবরাহিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এর অর্থ মিলনের স্থান কেবল স্ত্রী-অংশ (যোনি/Vagina)।'

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এর অর্থ তাদের নিকট পবিত্র অবস্থায় গমন করবে, ঋতুকালে নয়।'

আবু রাজিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এই আয়াতের অর্থ তাদের নিকট পবিত্রতার সময় গমন করবে।'

ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এর অর্থ হচ্ছে তখন তাদের নিকট গমন করবে যখন তাদের ঋতুকাল শেষ হয়ে গোসল করে তারা পবিত্র হবে।'

কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'পবিত্রতার সময় স্ত্রীদের নিকট গমন করবে, ঋতুকালে নয়।'

মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এর অর্থ হলো—তোমরা যিনা-ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়; বরং হালাল উপায়ে বিয়ের মাধ্যমে তাদের সাথে গমন করবে।'[১]

ওপরের মতামত থেকে এ কথা বুঝতে পারি, স্বামীর জন্যে হারাম হচ্ছে ঋতুকালীন সহবাস করা। কারণ, এ সময় যোনিতে ময়লা ও দুর্গন্ধ জমে থাকে এবং স্ত্রীর জন্য এ সময় সহবাস করা চরম কষ্টদায়ক। এ অপবিত্রতার সময় শেষ হয়ে পবিত্র হলে তখন আবার সহবাস করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সাথে এও অনুধাবন করতে

---

[১] *তাফসিরুত তাবারি*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৩৯১-৩৯২; *তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৯০-৯১

Scanned by CamScanner

পারি যে, স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাসের একমাত্র পথ হবে যোনি (Vagina)। যোনি ছাড়া পায়ুপথে মিলন মারাত্মক পর্যায়ের হারাম। কেননা, এটা স্ত্রীর জন্য আরো অধিক কষ্টদায়ক। এজন্যই হাদিসে এমন ব্যক্তিকে লানত (অভিশাপ) করা হয়েছে। তাহলে ২২২ নম্বর আয়াত সহবাসের সময় ও স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে, আর ২২৩ নম্বর আয়াত নির্ধারণ করেছে পদ্ধতি।

এবার ২২৩ নম্বর আয়াতের প্রথমাংশের দিকে তাকাই, যেখানে বলা হয়েছে—'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত্র'।

হুমায়ুন আজাদের মতো অনেক নাস্তিক ও ইসলামবিদ্বেষীই এই অংশটুকুর সমালোচনা করে। কারণ, এখানে স্ত্রীকে শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আমরা সেসব জ্ঞানপাপীকে বলব, কোনো কিছুকে উপমার সাহায্যে উপস্থাপন করাটা কি অন্যায়? মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে তুলতে মহান আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপমা প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

নিশ্চয়ই আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু মানুষ সবচেয়ে বেশি তর্কপ্রিয়।[১]

সুতরাং সুরা বাকারার ২২৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা উপমা হিসেবে নারীদের শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করেছেন। আর এতে শরিয়ত বা যুক্তি কোনো দিক থেকেই বিন্দুমাত্র সমস্যা নেই।

নারীদের কেন শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করা হলো?

এখন প্রশ্ন হলো নারীদের কেন শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করা হলো? যারা ভ্রূণবিদ্যার (Embryology) সামান্যতমও জ্ঞান রাখেন, তারা জানেন, পুরুষের গর্ভে সন্তানধারণ সম্ভব নয়। তবে সন্তানধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে পুরুষের শুক্রাণু (Sperm)। পুরুষের স্খলিত শুক্রাণু নারীদেহে স্থানান্তর লাভ করে। এরপর

---

[১] সুরা কাহফ, আয়াত : ৫৪

Scanned by CamScanner

নিষিক্ত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের মাধ্যমে নারীদেহে এক নতুন জীবনের সূচনা ঘটে। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়া থেকে শুরু করে, মানবশিশু জন্ম নেওয়া পর্যন্ত অনেকগুলো ধাপ অতিক্রান্ত হয়, আর এর সবগুলোই নারীদেহে ঘটে। নিচে অতি সংক্ষেপে সে ধাপগুলো উপস্থাপন করা হলো—

চিত্র : মানবশিশু বৃদ্ধির জটিল ধাপসমূহ

Fertilization

প্রাথমিক যৌনমিলনের মাধ্যমে পুরুষের দেহ হতে শুক্রাণু নারীদেহে পৌঁছে। পুরুষের দেহ থেকে একই সাথে প্রায় ১৫-২০০ মিলিয়ন শুক্রকীট (spermatozoa) নিঃসৃত হয়। তার মধ্যে প্রায় ১০০০ শুক্রাণু ফ্যালোপিয়ান টিউবে পৌঁছে। এর মধ্যে মাত্র ২০০ শুক্রাণু নিষেকের (fertilization) জন্যে ডিম্বাণুর নিকট পর্যন্ত যেতে পারে। কিন্তু ডিম্বাণু (ovum) নিষিক্ত হওয়ার জন্যে শুধু একটি পরিপক্ব শুক্রাণুর দরকার হয়। এই একটি শুক্রাণুকে ডিম্বাণুর সাথে নিষিক্ত হওয়ার জন্যে তিনটি পর্দা ভেদ (penetrate) করতে হয়। পর্দা তিনটি হলো—

» Corona radiate
» Zona pellucida
» Oocyte cell membrane

Scanned by CamScanner

এভাবে তিনটি পর্দা ভেদ করার পর শুক্রাণুটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় এবং ডিম্বাণুটি পুরুষের শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত শুক্রাণু ও ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণের (zygote) সূচনা হয়। নিষেকের পরে ডিম্বাণু তার মিয়োসিস (Meiosis) সম্পন্ন করে। ২৩ ক্রোমসোম (Chromosome)-বিশিষ্ট ডিম্বাণু ও ২৩ ক্রোমসোমবিশিষ্ট শুক্রাণু নিষিক্ত হয়ে ৪৬টি ক্রোমোসোমের সৃষ্টি করে। এরপর শুরু হয় প্রি-এমব্রায়োনিক পিরিয়ড (Preembryonic period)।

Preembryonic period

Cleavage : ১ম ক্লিভেজ (cleavage) ঘটে নিষেকের ৩০ ঘণ্টা পর। মাইটোসিস কোষ বিভাজন ৩ দিন ধরে অনবরত চলতে থাকে। নিষিক্ত কোষ ক্রমান্বয়ে বিভাজিত হতে শুরু করে। প্রতিটি বিভাজিত কোষকে blastomere বলে।

Morula : ৭২ ঘণ্টা পর নিষিক্ত ডিম্বাণু জরায়ুতে (Uterus) প্রবেশ করে। একে মরুলা বলা হয়।

Blastocyst : মরুলা ৪-৫ দিন যাবৎ অনবরত বিভাজিত হতে থাকে। যা পর্যায়ক্রমে ১০০-তে গিয়ে পৌঁছায়, এদের blastocyst বলে। Blastocyst ফাঁপা (hollow) এবং তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। এর প্রাচীরগাত্রকে বলা হয় ট্রফোব্লাস্ট (Trophoblast) যা প্লাসেন্টা তৈরিতে সাহায্য করে।

Implantation : নিষেকের ১০ দিন পর blastocyst এন্ডোমেট্রিয়ামের ভেতরে প্রোথিত হতে শুরু করে। এটা ১ সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে।

Primative Streak : যখন মানবভ্রূণের বৃদ্ধির বয়স ১৫-১৬ দিন হয় তখন এই ধাপ শুরু হয়। ২য় সপ্তাহের শেষের দিকে এসে hypoblastic কোষগুলো পুচ্ছ সম্বন্ধীয় অঞ্চলে চলে আসে এবং একটি লম্বা অনচ্ছতা (opacity) সৃষ্টি করে। একেই Primative Streak বলা হয়। এরপর এ থেকে তিনটি কোষের স্তর সৃষ্টি হয়, যা ectoderm, mesoderm, endoderm নামে পরিচিত। Ectoderm থেকে চামড়া ও স্নায়ুতন্ত্র তৈরি হয়। Mesoderm থেকে কঙ্কালতন্ত্র, পেশি, রক্ত সংবহনতন্ত্র, মূত্রতন্ত্র এবং প্রজননতন্ত্র তৈরি হয়। Endoderm থেকে পরিপাকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, প্রজননতন্ত্রের কিছু অংশ তৈরি হয়।

Scanned by CamScanner

Embryonic Stages

এটা ১৬ দিন বয়সে শুরু হয়, যা কয়েকটি ধাপে বিভক্ত।

Neurula : স্নায়ুতন্ত্র ভ্রূণের বৃদ্ধির সহায়তাকারী অন্যতম প্রধান তন্ত্র। এই ধাপে এসে মস্তিষ্ক তৈরি হয় এবং একই সাথে spinal cord ও রক্ত সংবহনতন্ত্রও তৈরি হয়। একটি সরল হৃৎপিণ্ড এ সময়ে রক্তপ্রবাহের সৃষ্টি করে, যা ভ্রূণকে বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবারহ করে।

Embryonic Membrane : এই ধাপে ভ্রূণের চারপাশে ভ্রূণীয় মেমব্রেন তৈরি হয়। যেমন : amnion (bag of waters), chornion (it becomes principal part of the placenta)।

Tailbud : এটি ৫ সপ্তাহ বয়সে শুরু হয়। এই সময়ে ভ্রূণের আকার একটি অ্যাসপিরিন ট্যাবলেটের মতো হয়। এই ধাপকেই tailbud বলা হয়।

Metamorphosis : এটি ৬ সপ্তাহে শুরু হয় এবং কমপক্ষে ২ সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। এই ধাপে এসে আঙুল-সহ দুই হাত-পা তৈরি হয়। ইন্দ্রিয়তন্ত্র এ সময়ে গঠিত হয়। চোখে পিগমেন্ট লেয়ার চলে আসে।

Fetal Stages : ফিটাস সব ধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধারণ করে। এই পর্যায়ে এসে মা ও সন্তানের মধ্যে সব ধরনের সংবহন শুরু হয়, ফিটাস মাতৃদেহ থেকে তার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি লাভ করে। ২য় মাসে এসে কোমলাস্থিগুলো ক্রমান্বয়ে শক্ত হতে থাকে। ৩য় মাসে এসে ফিটাসে হাতের ও পায়ের আঙুলে নখ তৈরি হয় এবং চুল গজায়। কিডনি সচল হতে শুরু করে এবং তার বিভিন্ন কার্যাবলি শুরু করে। এই ধাপে এসে বাচ্চা তার মুখ খুলতে পারে। চতুর্থ মাসে এসে বাচ্চার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। বাচ্চা জরায়ুতে নড়াচাড়া শুরু করে। পঞ্চম মাসে এসে বাচ্চা মায়ের পেটে লাথি দিতে সক্ষম হয়। এই ধাপে বাচ্চা তার আঙুল নাড়াচাড়া শুরু করে, হেঁচকি প্রদান করে এবং ঘুমাতে পারে।

ছয় মাস বয়সে এসে তার শরীরে তৈলাক্ত গ্রন্থির উৎপত্তি ঘটে। সাত মাস বয়সে এসে বাচ্চা তার শরীরের তাপমাত্রা, বৃদ্ধি, গ্রাস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই সাথে তার মস্তিষ্ক-বৃদ্ধি ঘটে। অষ্টম মাসে চোখ আলো বুঝতে পারে, ঘ্রাণ নিতে পারে কিন্তু কানের স্নায়ু পরিপূর্ণভাবে তখনো বেড়ে ওঠে না। নবম মাসে

Scanned by CamScanner

এসে ফিটাসের বৃদ্ধি পরিপূর্ণভাবে শেষ হয়। বাচ্চাটি তখন নতুন পৃথিবীতে আসার উপযোগিতা অর্জন করে। এই বয়সে সে তার মায়ের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে। আর দশম মাসে এসে সে পৃথিবীতে তার নতুন জীবনের যাত্রা শুরু করে।[১]

এবার আমরা একটু শস্যক্ষেত্রের দিকে নজর দেবো। শস্যক্ষেত্রে একটা বীজ কীভাবে অঙ্কুরোদ্গম হয়? আমরা অতি সংক্ষেপে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের বিষয়টা ব্যাখ্যা করছি—

প্রথম ধাপে এসে বীজ পানি দ্বারা পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় ধাপে পানি বীজে গিয়ে বীজের অভ্যন্তরস্থ এনজাইমকে সচল করে। ফলে বীজের উদ্গম শুরু হয়। পানি অভিগমনের জন্যে বীজ থেকে মূলের জন্মের মাধ্যমে তৃতীয় ধাপ শুরু হয়। চতুর্থ ধাপে বীজের অঙ্কুরোদ্গম শুরু হয় এবং তা সূর্যের আলোর দিকে যেতে থাকে। পঞ্চম ধাপে অঙ্কুরোদ্গমের পর আস্তে আস্তে পাতার সূচনা হয় এবং photomorphogenesis শুরু হয়। এভাবে আলোর প্রভাবে অঙ্কুর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

চিত্র : বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমের ধাপসমূহ

---

[১] ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়তে পারেন : T.W Sadler, Lungman's Medical Embryology; R.G Harrison, A Textbook of Human Embryology; Rani Kumar, Textbook of Human Embryology.

Scanned by CamScanner

ওয়াটারি ইমবাইবিশানের মাধ্যমে বীজের ভেতরে পানি প্রবেশ করে। এই পানি বীজের অভ্যন্তরস্থ এনজাইম, যেমন—অ্যামাইলেজ, প্রোটিয়েজকে সক্রিয় করে তোলে। এসব এনজাইমের মাধ্যমে ডাইজেশান ধাপ শুরু হয়। এনজাইম বীজের সঞ্চিত খাদ্য (প্রোটিন ও স্টার্চ) ভাঙতে শুরু করে। শুরু হয় এমব্রায়োনিক ডেভোলপমেন্ট। এ সময়ে বীজের ড্রাই মেটার কমতে শুরু করে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, বীজ তার সঞ্চিত খাবার থেকে পুষ্টি নিচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার যে খাবার উৎপন্ন হয় তা জলবিশ্লেষণ হয়ে Epicotyl, Hypocotyl, Radicle এবং Plumule-এ পৌঁছায় Cotyledon দিয়ে। Gibberellic acid এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ, এটা অঙ্কুরোদ্গম ও কচি চারা গজানোর প্রক্রিয়াকে সহজ করে। এরপর সিডিলিং গ্রোথ এবং এস্টাবলিশমেন্ট ধাপ শুরু হয়। এমার্জ হওয়া সিডলিং বড় হতে থাকে। এটা আবার দু-ধরনের।

» ইপিজিয়াল

» হাইপোজিয়াল

ইপিজিয়ালের ক্ষেত্রে কটাইলিডনকে (Cotyledon) সাথে নিয়ে চারা ওপরের দিকে ওঠে। আর হাইপোজিয়ালের ক্ষেত্রে কটাইলিডন মাটির নিচেই থাকে। পরবর্তীকালে চারা বড় হলে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এভাবে একটি শস্যক্ষেত্রে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। বীজ থেকে ফসল ফলে। শস্যক্ষেত্রে যেমন উদ্ভিদ বীজের মাধ্যমে জীবনের সঞ্চার ঘটায়, তেমনি নারীদেহও শুক্রাণুর সাহায্যে জীবনের উদ্ভব ঘটায়। শস্যক্ষেত্র হতে যেমন বীজ তার বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান লাভ করে, ঠিক তেমনি মাতৃদেহ থেকেও একটি শিশু তার জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান লাভ করে থাকে। একটি শস্যক্ষেত্রে যেমন বীজ বুনে দিলে সেখান থেকে জীবনের উদ্ভব ঘটে, ঠিক তেমনি প্রজননক্ষম একটি পরিপক্ব শুক্রাণু, ডিম্বাণুর সংস্পর্শে এলে নারীগর্ভে নতুন মনুষ্যজীবের উদ্ভব ঘটে। তাই নারীদেহ একটি শস্যক্ষেত্রের মতো—কুরআনের এই দাবি অযৌক্তিক নয়; বরং যৌক্তিক এবং বিজ্ঞানসম্মত।

কুরআন কি পুরুষকে সহিংস করে তুলছে নারীজাতির ওপর?

এখন বাকি রইল এই আয়াতের ওপর উত্থাপিত অভিযোগের দ্বিতীয় অংশ। যেখানে বলা হয়েছে—

Scanned by CamScanner

'অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারো।'

এই আয়াতাংশ প্রকৃতপক্ষে কী বোঝাচ্ছে? এই আয়াত কি পুরুষকে সহিংস করে তুলছে নারীজাতির ওপর? কেড়ে নিচ্ছে নারীর স্বাধিকার? নারীকে পুরুষের কাছে করে তুলছে অসহায়? এবার তাহলে একটু সামনে আগাই—

চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসারে এ কথা প্রমাণিত নয় যে, স্বামী যদি স্ত্রীর সামনের দিক থেকে যোনিতে মিলন না করে পার্শ্ব পরিবর্তন করে যোনিতে মিলন করে, তবে সন্তান ট্যারা কিংবা বিকলাঙ্গ হবে। কিন্তু ইহুদিরা মনে করত, স্বামী যদি পেছন দিক থেকে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে সন্তান ট্যারা হবে। তখন সাহাবিগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ইহুদিদের বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অপর এক বর্ণনা থেকে জানা যায়—ইসলামগ্রহণের পর মক্কার মুহাজির সাহাবিগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মক্কা হতে আগত একজন মুহাজির সাহাবি মদিনার একজন আনসারি নারীকে বিয়ে করেন। বিয়ের রাতে স্বামী তার স্ত্রীকে ইচ্ছেমতো যোনিতে সহবাসের দেন; কিন্তু স্ত্রী সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন, আমি ওই একটি নিয়ম[১] ছাড়া আর কোনো নিয়মে সহবাস করব না। এই ঘটনার কথা একসময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গিয়ে পৌঁছয়। অতঃপর উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[২]

এই আয়াতের মাধ্যমে এটি সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে, স্বামী ও স্ত্রী তাদের বৈবাহিক জীবনের একে অপরের সাথে যেকোনো পন্থায় মিলিত হতে পারবে; কিন্তু মিলিত হওয়ার স্থান একই হতে হবে অর্থাৎ যোনি (Vagina)। এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণের মতামত জেনে নিই—

---

[১] মুখোমুখি অবস্থানে থেকে কেবল সামনের দিক হতে যোনিতে মিলন।

[২] *তাফসিরুত তাবারি*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৪০৯-৪১১; *তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৯১-৯২; *তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫৮৮-৫৮৯; *আদ-দুররুল মানসুর*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৬২৬-৬২৭; *তাফসিরুল বাগাবি*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৯-২৬০; *তাফসিরুল কাবির*, খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ৪২১; *তাফসিরুল কাশশাফ*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৬৬

Scanned by CamScanner

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নিকট সামনের দিক থেকে কিংবা পেছনের দিক থেকে মিলিত হতে পারো। তবে ঋতুস্রাবের সময় এবং পায়ুপথে সহবাস করা যাবে না।'

ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যেভাবে ইচ্ছা স্ত্রীর সাথে সেভাবেই মিলিত হতে পারবে। তবে পায়ুপথ ব্যবহার করতে পারবে না।'

মুজাহিদ রাহিমুহুল্লাহ বলেন, 'স্ত্রীর সাথে যে পদ্ধতিতে ইচ্ছা সহবাস করতে পারবে। কিন্তু ঋতুস্রাবের সময় এবং মলদ্বারে সহবাস করা যাবে না।'

ইবনু কাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এর অর্থ স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দাঁড়িয়ে, শুয়ে, কাত হয়ে, সামনের দিক থেকে কিংবা পেছনের দিক থেকে সব পদ্ধতিতেই সহবাস করতে পারবে। শর্ত একটাই—সহবাস যোনিপথে হতে হবে।'

কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এর অর্থ দাঁড়িয়ে, বসে কিংবা একপাশ থেকে যেভাবে ইচ্ছা স্বামী তার স্ত্রীর নিকট গমন করতে পারে। তবে তার যৌনাঙ্গ (যোনি) ব্যতীত অন্যদিকে সীমালঙ্ঘন করতে পারবে না।'[১]

ইবনু জাফর তাবারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আয়াতটির সঠিক ব্যাখ্যা এটাই যে, 'শস্যক্ষেত্রে যাওয়ার পথ দিয়ে তোমরা যেভাবে চাও সেভাবেই তোমাদের শস্যক্ষেত্রের নিকট গমন করো।' সুতরাং উক্ত আয়াতের মাধ্যমে যারা পায়ুপথে গমন করাকে বৈধ প্রমাণ করতে চায়, তাদের কথা নির্ঘাত ভুল। কারণ, আল্লাহ তাআলা যেভাবেই হোক না কেন, কেবল শস্যক্ষেত্রেই গমন করার অনুমোদন দিয়েছেন। পায়ুপথে যেহেতু শস্য উৎপাদন হয় না, তাই তা শস্যক্ষেত্রও নয়। অতএব, সেখানে সহবাস করা থেকে বিরত থাকতে হবে।'[২]

পায়ুপথে গমন যে মারাত্মক পর্যায়ের হারাম, এ ব্যাপারে বেশ কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে।[৩] কিছু হাদিসে এমন জঘন্য কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে লানত বা অভিশাপ দেওয়া

---

[১] *তাফসিরুত তাবারি,* খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৩৯৮-৪০০; *তাফসিরু ইবনি কাসির,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫৮৯

[২] *তাফসিরুত তাবারি,* খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৪১৬

[৩] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি স্ত্রীর মলদ্বারে সংগম করল অথবা গণকের নিকটে গেল এবং সে (গণক) যা বলল, তা বিশ্বাস করল; সে অবশ্যই মুহাম্মাদের ওপর নাযিলকৃত

Scanned by CamScanner

হয়েছে।[১] এবং কিছু হাদিসে এমন ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।[২] ইসলামবিদ্বেষীরা অযথাই এই আয়াতকে ব্যবহার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। তারা বলতে চায়, আয়াতটি পুরুষকে নারীর ওপর স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছে। যেভাবে খুশি সেভাবে স্ত্রীকে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছে। অথচ আমরা দেখেছি, আয়াতটি তাদের দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ নির্দেশ করেছে। আয়াতটি পুরুষকে সংযমী করেছে। উগ্রতা প্রদর্শনপূর্বক পুরুষ যেন নারীকে কষ্ট না দেয়, সেজন্য পায়ুপথে গমন নিষেধ করেছে। আয়াতটির শেষের দিকে এ কথাও বলে দিয়েছে, 'তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্যে কিছু করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। আর জেনে রেখো, আল্লাহর সাথে তোমাদের অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে। আর আপনি মুমিনদের সুসংবাদ দিয়ে দিন।'

আয়াতটিকে কেউ যদি বাস্তবতার সাথেও মেলায়, তবুও নাস্তিকদের দাবি ভুল বলেই প্রমাণিত হবে। কেননা, একজন বিবেচনাবোধসম্পন্ন চাষী কখনোই শস্যক্ষেত্রকে অবহেলা করে না। অযত্ন করে দূরে ঠেলে দেয় না; বরং সে বীজ রোপণের সময় থেকে শুরু করে ফসল ঘরে তোলা পর্যন্ত নিজের সন্তানের মতো শস্যক্ষেত্রের পরিচর্যা করে। তাই শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করা মানেই যাচ্ছেতাই আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া, এই দাবি বাস্তবতা-বিবর্জিত।

জিনিসের (কুরআন কারিম) বিরুদ্ধাচরণ করল।' [*মুসনাদু আহমাদ* : ৯২৯০; *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৯০৪; *জামি তিরমিযি* : ১৩৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৬৩৯

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ৯৭৩৩, ১০২০৬; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২১৬২; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ৮৯৬৬; *মুসতাখারাজু আবি আওয়ানা* : ৪২৯২; *মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার* : ১৪০৬৯

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ৭৬৮৪; *সুনানুদ দারিমি* : ১১৮০; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৯২৩; *সুনানুন নাসায়ি* : ৮৯৬২; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ১৬৮১১

Scanned by CamScanner

তারা ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ তাঁর নুরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেনা কাফিররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেনা

[সুরা সাফ, আয়াত : ৮]

সমকালীন প্রকাশন

Scanned by CamScanner